ছোবল

নারায়ণ সান্যাল

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

শেষ পর্যন্ত চাকরিটা গেলই।

পাকা পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি। না, ভুল হল, পঁয়ত্রিশ নয়—প্রায় সাড়ে চৌত্রিশ। চাকরির শুরু এই কালীতারা প্রেসের জন্মলগ্নে। সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে—ছত্রিশ সালের অক্ষয়-তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে; আর আজ ও চাকরি খোয়ালো এই একাত্তর সালের ছাব্বিশে এপ্রিল। চাকরির বয়স ওর জীবনের প্রায় আধাআধি। ঢুকেছিল যখন তখনো ত্রিশ হয়নি—এখন পক্ককেশ বৃদ্ধ। আগামীকাল থেকে কালীতারা প্রেসের হাজরি-খাতায় আর লেখা হবে না মান্ধাতার বাবার আমলের সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিটির আঁকাবাকা স্বাক্ষর।

চাকরিটা আজ কয় বছর ধরে পাকা পেয়ারাফুলি আমটির মতো বোঁটা আঁকড়ে টাল-মাটাল দুলছিল—কথাটা জানতো ম্যানেজার থেকে শম্ভুচরণ, মায় ওদের প্রেসের কম্বাইণ্ডহ্যাণ্ড বংশী পর্যন্ত। আসল কারণটা কেউ বুঝে উঠতে পারেনি—আপাতদৃষ্ট হেতুটা না বোঝার কোনও কারণ নেই। আর পাঁচজনের চোখে তো ওর মতো ছানি পড়েনি।

ছানি-পড়া চোখে যদি প্রুফ-রীডারির গাণ্ডী পাড়ি দেওয়া যায়, তাহলে বেতো ঠ্যাঙ নিয়ে ঝুমুরদলে কিংবা তোৎলামি নিয়ে যাত্রাদলে মেডেল পাওয়া যেত। তবে নাকি মুরারীদা এই ছাপাখানার সবচেয়ে পুরানো লোক—সিনিয়ার মোস্ট স্টাফ—ঐ প্রথম ট্রেডল-মেশিনটারও আগে চৌকাঠ মাড়িয়েছে এ প্রেসের, তাই সবাই ভেবেছিল মালিক এবারেও ক্ষমাঘেন্না করে ব্যাপারটা মেনে নেবেন।

নিলেন না। www.banglabookpdf.blogspot.com

ওরা ভাবল, বারে বারে বাড়াবাড়িটা বরদাস্ত করলে ব্যবসা চলে না।

ওরা জানে না ভিতরের কথাটা—ঐ বাপের আমলের বুড়োটাকে দুচক্ষে দেখতে পারত না রত্নেশ্বর। কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারেনি। ঐ যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে না—'নেসেসারি ঈভল'—মুরারী রায় ছিল সেই জাতের অনাসৃষ্টি। আজ ঐ সিন্ধুবাদটিকে ঘাড় থেকে নামাতে পেরে বেঁচেছে রত্নেশ্বর। মুরারী রায় মালিকের বাপের সমবয়সী না হলেও ছিল তাঁর দক্ষিণ হস্ত। তখন ওর বয়স কম। সবটাই শোনা কথা। ঐ বৃদ্ধটি নাকি আদিযুগে এ প্রেসের সব কিছু। জুতো শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সেরে বুক দিয়ে খাড়া করেছে সেটাকে, বলতে গেলে একা-হাতে। সেজন্য মালিকের কাছে এতদিন

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সম্মান-সমীহও কিছু কম পায়নি। কর্মচারীদের মধ্যে ঐ একটিমাত্র বৃদ্ধকেই সে 'আপনি' বলে কথা বলে। আগেকার জমানায় তাকে 'মুরারীকাকা' ডাকত —ইদানিং সম্বোধনটা এড়িয়ে চলে।

কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা থাকবে তো?

ছোটখাট্ট মানুষ। মাথায় ফুট-পাঁচেক। কদমছাঁট এক মাথা সাদা চুল, চোখে নিকেলের চশমা। একটা ডাঁটি ভেঙে গেছে। সেদিকটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। গেঞ্জির মাপ ছাব্বিশ ইঞ্চি। মালকোঁচা-সাঁটা খাটো ধুতি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো আর গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। তার পকেট-দুটি ভাদ্রের বাঁওড়ের মতো সদাই টইটম্বুর—বিড়ি-দেশলাই, পাণ্ডুলিপি, গ্যালিপ্রুফ, চশমার খাপ। প্রেসের প্রতিটি কোণা তার নখদর্পণে। কম্পোজিশান, প্রুফ দেখা, মেমো-ইন্ডেন্ট-ইনভয়েস—মায় মেশিন বিগড়ালে টুকিটাকি মেরামতি পর্যন্ত। ছেলে-পিলে নেই—সংসারে আছে বুড়ি গিন্নি। আদি নিবাস মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে। ভাগ্যান্বেষণে বার হয়ে এসেছিল কিশোর বয়সে। লেখাপড়া খুব কিছু শিখতে পারেনি। যে বছর ম্যাট্রিক দেবে সেবারই ওর পিতৃবিয়োগ হয়। বাবা ছিলেন পাঠশালার পণ্ডিতমশাই। 'ফি'-র টাকা যোগাড় হয়নি; ফলে পরীক্ষাটাও দেওয়া হয়নি। দেশের বাড়িতে আছে কিছু জমিজমা। জানত শুধু একটাই কাজ—প্রেসের কাজ। রত্নেশ্বরের বাবা যজ্ঞেশ্বরের দৌলতে রুজি-রোজগারের একটা হিল্লে হয়ে গেছিল। তারপর তিন-তিনটে দশক কেটে গেছে একই ঢঙে।

মরাকাটা ঘর পার হয়ে ঘুর্ণির দিকে একটা দেড়-কামরার টিনের ঘর ভাড়া নিয়েছিল তিন দশক আগে। মাসিক সাত টাকা ভাড়ায়। তাতেই কেটে গেল একটা জীবন। বুড়োবুড়ির। বুড়ি বেতো রুগী। নেংচে নেংচে কোন ক্রমে বাথরুমে যেতে পারে। কুয়ো থেকে জলটাও টেনে তুলতে পারে না। মুরারী সাত সকালে ওঠে। ঘুর্ণির 'পাম্পিং-স্টেশন' ঘাটে খড়েতে স্নান সেরে এসে উনুনে আগুন দেয়। আগে একটু পুজাপাঠ জপতপ করত—গিন্নি বেজুত হবার পরে সেটাও গেছে। শুধু স্নান সেরে ফেরার পথে গঙ্গাস্তোত্রটা আওড়াতে আওড়াতে আসে। সেটুকু পুণ্যফলে যদি স্বর্গে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মুরারীদা নাচার। সময় কোথা? নটার মধ্যে যা পারে রাঁধে। বাগানেই ফলে ঝিঙে, কুমড়ো, বেগুন, লঙ্কা। সাড়ে নটার মধ্যে দুটি নাকে মুখে গুঁজে সাইকেলে চেপে রওনা হয়। গিন্নির ভাতটা ঢাকা দিয়ে রেখে আসে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সাইকেলটা ও কেনেনি—ওটা তার দাদার দান—মানে, প্রাক্তন মালিক যজ্ঞেশ্বরের। দশটা বাজার আগেই প্রেসে পেঁছে যায়। কোন কোনদিন আসার পথে তাগাদাও দিতে হয় কিনা—ঐ যারা প্রেসে কাজ করায়, পয়সা দিতে গড়িমসি করে। তারপর প্রেসে এসে তালা খুলে জাঁকিয়ে বসে। সারাটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় মালুম হয় না। দেড়টার সময় টিফিন। পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না এটাই রক্ষে। এটাও প্রাক্তন মালিক যজ্ঞেশ্বরের অবদান—প্রত্যেকটি কর্মী পায় দু-পীস, মানে আধখানা করে পাউরুটি আর এক প্লেট ঘুঘুনি, অথবা ছোলার ডাল। কোনদিন বা লক্ষ্মণের ডালপুরি। লক্ষ্মণ যা ডালপুরি বানায় —লা-জবাব! ম্যানেজারের যেদিন মেজাজ সরিফ থাকে সেদিন ঐ শুকনো পাউরুটির বদলে কর্মীরা পায় গোয়াড়ি-গঞ্জের ঐ সরেশ মুখরোচক: লক্ষ্মণের ডালপুরি! যাকে বলে ফাস্টু-কেলাশ! ফ্রি। বাড়ি ফিরতে কোনদিন সন্ধ্যা, কোনদিন নিশুতি রাত।

মালিকের মুখে অন্তিম নিদানটা শুনে মুরারীদা কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। এমন ঘটনা ওর জীবনে আগেও ঘটেছে—মানে চাকরি-খতমের নোটিস্ পাওয়া—কিন্তু এবার যেন মনে হলঃ এটা ফাঁকা আওয়াজ নয়। এবার রত্নেশ্বর বদ্ধপরিকর!

চোখে জল নেই। চোখ দুটো কড় কড় করছে। ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় গলকণ্ঠটা বার কতক ওঠা-নামা করল শুধু।

—বুঝেছেন? কাল থেকে আর আসতে হবে না আপনাকে। এবার সত্যি সত্যিই বিদায় হলেন। বুড়ো হয়েছেন, এবার বিশ্রাম করুন। পরকালের কথা কিছুটা ভাবুন। জপতপ করুন।

মুরারীদা কী একটা কথা বলতে গেল। তারপর সামলে নিল। মুহূর্তে মনস্থির করল। নাঃ! কারও দয়ায় প্রাণধারণের এ উঞ্ছবৃত্তি আর পোষাবে না। অনেক সয়েছে, আর নয়। সত্যিই তো, চোখে আজকাল ভাল দেখে না। ডাক্তার বলেছে—পেকেছে, ছানিটা কাটানো যায়; কিন্তু ও সাহস পায়নি। 'সাহস পায়নি' বলাটা ঠিক নয়। বেতো বুড়িটাকে একা ফেলে সে চোখ কাটাতে যায় কোন আক্কেলে? না হলে প্রতি শীতেই তো বিনা-খরচায় চোখ-কাটানো ডাক্তারেরা আসেন—কচাকচ সবার ছানি কেটে দেন। তাই মাথা নিচু করে ঠায় দাঁড়িয়েই রইল।

মালিক রসিয়ে রসিয়ে যোগ করে, আর শুনুন। সেবারের মতো আপনার

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বোঠানের কাছে গিয়ে যেন ধর্না দেবেন না। এবার তাতে লাভ হবে না কিছু। হুকুম নড়বে না। মাঝখান থেকে আপনার বোঠান বেইজ্জত হবেন বেহুদো। বুঝেছেন ?

হ্যাঁ, বুঝেছে। না বোঝার কী আছে ? 'বোঠান' অর্থ রত্নেশ্বরের মা-জননী। যদিও রত্নেশ্বর ইদানিং ওকে 'মুরারীকাকা' ডাকে না কিন্তু তিনি ওকে 'মুরারীঠাকুরপো' বলেন। রত্নেশ্বরের দাপটে সেই বৃদ্ধা যে পূজাঘরের চার-দেওয়ালের ভিতর আত্মগোপন করে আছেন এই মর্মন্তুদ সত্যটা জানা ছিল তার। তবে রতনের ঐ অভিযোগটা কিন্তু সত্যি নয়। সেবার—মানে আগেরবার চাকরি যাবার পরে সে তার বোঠানের কাছে ধর্না দেয়নি। বোঠানই আগবাড়িয়ে যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সে-সব কথা রতনকে বলতে যাওয়া বৃথা। তাই মুরারীদা কোনও জবাব দিল না। মুখটা তুলতে পারল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ক্যাম্বিসের জুতোর অন্তর-বিদীর্ণ করা ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটার দিকে।

—যান এবার। কাল সকালে এসে এপ্রিল মাসের মাইনেটা নিয়ে যাবেন। মাসের এখনো চার চারটে দিন বাকি ; তা হোক—পুরো মাসের মাইনেটাই দেব আপনাকে। যান।

হঠাৎ কী যেন হল বৃদ্ধের !

আচমকা ওর মানসপটে ভেসে উঠল এক সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণের মূর্তি—ওর গুরু ! সেই যাঁর কাছে প্রেসের কাজে ওর হাতেখড়ি। তাঁরও ছিল একমাথা পাকা-চুল, ঝোলা গোঁফ, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গলায় বেলের আঠা দিয়ে মাজা সামবেদী পৈতে। পিতৃবিয়োগের পর তাঁরই ছাপাখানায় প্রথম কাজ শিখেছিল। তাই ফস্ করে বলে বসল, না, না, তা কেন ? তুমি শুধু ছাব্বিশ দিনের মাইনেটাই চুকিয়ে দিও। কাজ না করে বাকি চারদিনের মাইনে নেব কেন ?

রত্নেশ্বর কোনক্রমে জিহ্বাকে সংযত করল ! আশ্চর্য ! বুড়ো ভাঙবে তবু মচকাবে না ! কাল থেকে কী করে হাঁড়ি চড়বে সে খেয়াল নেই ! এখনও তেজ দেখাচ্ছে ! বোধকরি বুড়োটা ভাবছে—এবারও একে ধরে, তাকে ধরে চাকরিটা বজায় রাখতে পারবে—হয় ওর বৌঠান, নয় মা-জননী, অথবা ঋদ্ধি ! জানে না—এবার ওকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না রত্নেশ্বর। লোকটা এখন আর 'নেসেসারি ঈভল্' নয়—অর্থাৎ 'ঈভল্' বটেই, কিন্তু 'নেসেসারি' নয়। ওকে বাদ দিয়েও প্রেস দিব্যি চলবে। সুইংডোরটার দিকে তর্জনী-সংকেত করে শুধু

www.banglabookpdf.blogspot.com

বললে—যান !

নিঃশব্দে সুইং-ডোর ঠেলে এবার বাইরে বার হয়ে এল। সেখানে একটা জটলা। সুরেন, কিষ্টো, গোলাম কুদ্দুস আর শম্ভুচরণ, মায় বংশী। সরে-নড়ে তারা পথ করে দিল। কেউ রা কাটল না। মুরারীদাও নয়। হাসিখুশি মানুষটা যেন আজ অন্যরকম। মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। ঠিক সেবারের মতো।

ইতিপূর্বে আরও একবার মুরারীদার চাকরি যায়। বছর দেড়েক আগে। সেবার বোঠানের হস্তক্ষেপে রত্নেশ্বর তার আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তবে সেবার অপরাধটা এমন আকাশচুম্বী ছিল না। মর্মান্তিক এক রসিকতাই সেবার ওর কাল হতে বসেছিল। এবারেও অবশ্য তাই। মুরারীদার ঐ এক চারিত্রিক দুর্বলতা। কথার পিঠে জবর-জবাব মুখে এলে বলে ফেলবেই। কোথায়, কাকে, কী বলছে তা খতিয়ে দেখবে না !

ওর এই চারিত্রিক দুর্বলতা নিয়ে অনেকে ওকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছে। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা, সহকর্মীরা এমন কি ওর পাতানো নাতির দল। তারা বলত, মুরারীদা, স্বভাবটা বদলাও, নাহলে মরবে একদিন।

মুরারীদা হাসতে হাসতে বলত, বলছিস ? অর্থাৎ কোন ক্রমে স্বভাবটা বদলাতে পারলে আর কোনদিন মরব না ? বিভীষণ, অশ্বত্থামার মতো অজর-অমর হয়ে থাকব ? অথবা পবননন্দনের মতো ডালে-ডালে হুপ্-হুপ্ করে দাপাদাপি করব শেষ-প্রলয়-তক্ ?

ওরা বলত, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা !

মুরারীদা বলত, এই তো ! বুঝে ফেললি ! তাহলে বেহুদো তর্ক করিস কেন ? ভেবে দেখ—মুখে-মুখে লা-জবাব জবাব দিতেন বলেই আমার গুরুদেব অমর হয়ে আছেন—কলকাতা আজও 'কেবল ভুলে ভরা' ! 'বিদূষক' নেই, কিন্তু গানটা আছে ! সত্যি কিনা বল্ ? তাছাড়া কী জানিস্ ? এ রোগ আমার শোধরাবার নয়। এ হল গিয়ে যাকে বলে আমার গুরুপ্রসাদী ! তোরা তো জানিস্‌ই আমার গুরু ছিলেন কথার-পিঠে কথা বলায় এক দুর্লভ শাহেনশা ! তেমন-তেমন কথা মনে এলে বলে ফেলতে দ্বিধা করতেন না ! লালগোলার মহারাজকে তিনি ফস্ করে বলে বসলেন—'আপনি তো মশাই একজন পানি-পাঁড়ে !' আর কারও হিম্মৎ হত ওকথা বলার ?

তা বটে ! মুরারীদা ষোলো-সতের বছর বয়সে প্রথম চাকরি করতে যায়

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দাদাঠাকুরের কাছে। চাকরি ঠিক নয়—পেট-ভাতারি গুরুগৃহে কাজ শেখা। 'জঙ্গীপুর সংবাদ' প্রেস-এ। দা'ঠাকুর ওকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন ট্রেডল মেশিন চালানো, প্রুফ-দেখা, হ্যাণ্ড-কম্পোজিশান, মায় টুকিটাকি মেরামতি পর্যন্ত। ঐ সঙ্গে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে গুরুর অমোঘ প্রভাব ঐ কিশোর-বয়স্কের রসসিক্ত জিহ্বায়—চটু-জলদি জবাব দেবার দুর্লভ দক্ষতা।

দা'ঠাকুর ওকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, মুরারী, তুই পরীক্ষাটা দে। 'ফিজ'-এর টাকা কটা আমিই দেব—না রে, দান নয়, ধার। তুই কাজ করে ধীরে ধীরে তা শোধ করে দিস, কেমন ?

মুরারীদা প্রতিপ্রশ্ন করেছিল, এ প্রস্তাব তো লালগোলার 'পানিপাঁড়ে' আপনাকেও দিয়েছিলেন—হাত পেতে নিতে পারেননি কেন ? তার জবাবে দা'ঠাকুর ওর পিঠে একটা বিরাশী-সিক্কা থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন, বাহা রে বাহা! 'বাঘের বাচ্ছারে বাঘ না করিনু যদি, কী শিখানু তারে ?' ঠিক আছে, মুরারী, পরীক্ষা না দিলি তো নাই দিলি, পড়াশুনাটা তোকে চালিয়ে যেতে হবে। আমার কাছে। বুঝলি ? রোজ সন্ধ্যার পর আমার কাছে বই নিয়ে পড়তে বসবি!

তা বসত। সারাদিন ট্রেডল-মেশিন চালিয়ে সন্ধ্যার পর বই-খাতা নিয়ে পড়তে বসত তাঁর পায়ের কাছে। শিখেছে অনেক কিছু। আজ তার অনেক কিছু আবার ভুলেও গেছে। যা ভোলেনি তা ঐ সূক্ষ্ম রসিকতা-বোধটুকু। বিদূষকের ভূমিকাটুকু ঃ "কিবা রোষে কিবা তোষে যার পরিহাস / বিদূষক তার নাম হাস্যের বিলাস॥"

তাতে ভুগতেও হয়েছে ওকে।

সেবার যেমন। বছর-দেড়েক আগে যেবার ওর প্রথম চাকরি যায় ঃ

স্থানীয় কলেজের ম্যাগাজিনটা ছাপা হয় এই কালীতারা প্রেস থেকে। বলা যায় দু-পুরুষ ধরে। বস্তুত দু-দশক আগে, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মুরারীদাই কাজটা আদায় করে এনেছিল তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে ধড়পাকড় করে। সে প্রিন্সিপ্যালও নেই, সেই মালিকও নেই—কিন্তু কাজটা আছে। বছর-বছর কলেজ ম্যাগাজিন এখান থেকেই ছাপা হয়।

সেবার ছাপা ম্যাগাজিনের একটি কপি হাতে করে বাঙলার অধ্যাপক করুণাময়বাবু এসে উপস্থিত হলেন প্রেসে। রত্নেশ্বর শশব্যস্তে বলে, আসুন, আসুন স্যার, বসুন।

—আর বসুন! আগেই তো পথে বসিয়ে দিয়েছেন, দত্তমশাই।

—কেন স্যার ? কী হল ?

—কী হয়নি ? হয় আপনি প্রুফ-রীডার বদলান, নইলে আমরাই প্রেসটাকে বদলাই।

ছাপা ম্যাগাজিনটা পাতায় পাতায় দাগানো। সেটা বাড়িয়ে ধরেন রত্নেশ্বরের দিকে। এত ছাপার ভুল কলেজ-ম্যাগাজিনে বরদাস্ত করা যায় না। মান রাখতে রত্নেশ্বর হাঁকাড় পাড়ে, মুরারীবাবু ?

নিকেলের চশমার কাচটা মুছতে মুছতে গরুড় পক্ষীর মতো এসে দাঁড়ায় ছোট্টখাট্ট মানুষটা।

—এসব কী হয়েছে ?—জলদগম্ভীরস্বরে কৈফিয়ৎ তলব করে রত্নেশ্বর।

মুরারী স্পিকটি নট্। কৈফিয়ৎ কী বা দেবার আছে ? রত্নেশ্বর বলে, হয় ছানিটা কাটান, নয় বিদায় হন। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই থাকে। না রত্নেশ্বর, না করুণাময়বাবু—দুজনের কেউই তখন আন্দাজ করতে পারেননি ভর্ৎসিত ঐ বৃদ্ধের অন্তঃকরণে তখন কী চিন্তা জাগছিল। মুরারীদা মনে মনে ভাবছিল—রতনের শেষ ক্রিয়াপদটা 'বিদায় হন' না হয়ে হওয়া উচিত ছিল 'কাটুন'। তাহলে 'কাটা' শব্দটার যমক হত। যমক ছাড়া ধমক হয় ?

করুণাময়বাবু বলেন, হ্যাঁ মশাই, 'ছোবল' কথাটায় চন্দ্রবিন্দু এল কোথা থেকে ? কোন অভিধানে পেলেন ? চুপ করে থাকলেই লেঠা চুকে যায়—কিন্তু 'স্বভাব না যায় মলে'! বিদূষকের মন্ত্রশিষ্যটি বেমক্কা বলে বসল, আজ্ঞে ঢোঁড়া সাপের ছোবলে চন্দ্রবিন্দু থাকে না, কিন্তু এখানে কাল-কেউটের বাচ্ছার কথা বলা হয়েছে তো ? তাই ভাবলাম—

বাঙলা-অধ্যাপকমশায়ের চোখ কপালে ওঠে। বলেন, মানে ? সাপের জাত বদল হলে 'ছোবল'-এর বানানে বদল হয় ?

বিনয়ে বিগলিত মুরারীদা হাত দুটি কচলে বলে বসে, বিবেচনা করে দেখুন স্যার! কেউটের ছোঁবল খাওয়ার পূর্বমুহূর্তে যিনি শ্রীযুক্ত অথবা শ্রীযুক্তা, ছোঁবল খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁর নাম লিখতে একটা চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োজন হয়। ঢোঁড়াসাপের ক্ষেত্রে তা হয় না!

অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছিলেন করুণাময়বাবু। বলেন, এটা কিন্তু জবর কৈফিয়ৎ!

রত্নেশ্বরও ফেটে পড়েছিল। অট্টহাস্যে নয়, রাগে। করুণাময় বিদায় হবার

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পরে বিদায়ী বিল্বপত্রটি ধরিয়ে দিয়েছিল অধঃস্তন কর্মচারীর হাতে। মুরারীদা প্রথমটা বুঝতে পারেননি। জানতে চায়, কী ওটা?

—কেউটের 'ছোবল'! পড়লেই বুঝতে পারবেন! কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুরারীদা বলেছিল, অ! তাড়িয়ে দিচ্ছ? তা আমার কাছে যেসব কাগজপত্র আছে তা কাকে বুঝিয়ে দেব?

—আপনার কাছে আবার কী কাগজপত্র আছে?

—তা আছে রতন—এই নাও ধর—

ফতুয়ার পকেট থেকে এক গোছা কাগজ নামিয়ে রেখেছিল মালিকের টেবিলের উপর। গ্যালিপ্রুফ, পাণ্ডুলিপি, ক্যাশমেমোর বই। বলেছিল, চলি তাহলে?

খানিক গিয়েই আবার ফিরে আসে। বলে, ভাল কথা মনে পড়ল, ইয়ে হয়েছে—নিলাম ইস্তাহারের কাগজগুলো কাল সকালে ডেলিভারি দেওয়ার কথা। ভুলে যেও না আবার। যা ভুলো মন তোমার!

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল রত্নেশ্বর, বৃদ্ধের স্পর্ধা দেখে।

সেবার চাকরি ওর যায়নি। বৌঠানের দয়ায়।

আগে নাম ছিল হাইস্ট্রীট, এখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড। শহরের সবচেয়ে চওড়া সড়ক। রত্নেশ্বরের ভদ্রাসন সেই সড়কে। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। একতলায় সারি-সারি দোকান ঘর। মনিহারী দোকান, সেলুন, কাটা-কাপড়ের দোকান। দোতলায়-তেতলায় নিজেরা থাকে। ভাড়া দেয়নি। সংসারে যদিও কুল্যে চারটি প্রাণী—মা, বউ আর একমাত্র ছেলে, ঋদ্ধি। মুরারীদা রতনের চেয়ে বয়সে পনের বছরের বড়, আবার রতনের পিতৃদেব যজ্ঞেশ্বর ছিলেন মুরারীর চেয়ে পনের বছরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ। যজ্ঞেশ্বরই কালীতারা প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। মুরারী রায় ছিল তাঁর দক্ষিণহস্ত। প্রথম যুগে প্রেসের যাবতীয় দায়ঝক্কি ছিল মুরারীর স্কন্ধে। মালিক শুধু হিসাব রাখতেন। সে আমলে মুরারীদাকে প্রেসের তালা খুলে ঝাঁট দিতেও হয়েছে।

প্রাকস্বাধীনতা যুগেই দাঁড়িয়ে গেছিল প্রেসটা। তখন এ বাড়ি একতলা। দ্বিতল-ত্রিতল হয়েছে পরবর্তী জমানায়। যজ্ঞেশ্বর প্রেসটাকে খাড়া করেছিলেন বটে, সঞ্চয় খুব কিছু করতে পারেননি। আর্থিক উন্নতি যা কিছু তা রত্নেশ্বরের কৃতিত্ব।

রবরবার কণামাত্রও প্রেস থেকে নয় কিন্তু। প্রেস থেকে যা রোজগার তাতে

www.banglabookpdf.blogspot.com

রতনের হাত খরচাটুকু ওঠে কিনা সন্দেহ। ওর উপার্জনের উৎসমূল অন্যত্র। সে আবার এক বিচিত্র কাহিনী:

কী একটা সামান্য কারণে বাপে-ছেলেয় রাগারাগি। সেটা যুদ্ধের আমল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। রতনের বয়স তখন কুড়ি-বাইশ। পড়ত কলকাতায় থেকে। নানান বদ-অভ্যাসে পোক্ত হয়ে পড়েছিল ছাত্রজীবন থেকেই। তাই নিয়েই মনোমালিন্য। বাবা রাগ করে বললে, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে! তোর মুখ দর্শন করব না!

ছেলেও এক কাপড়ে বেরিয়ে গেল।

ব্যস্! গেল তো গেল একেবারে না-পাত্তা। যুদ্ধের বাজার! নানারকম গুজব ছড়াচ্ছে। কলকাতা থেকে দলে দলে লোকে পালাচ্ছে—জাপানী বোমার ভয়ে। রত্নেশ্বরের গর্ভধারিণী অন্নজল ত্যাগ করলেন। বাধ্য হয়ে যজ্ঞেশ্বর মুরারীকেই পাঠিয়ে ছিলেন বুঝিয়ে সুঝিয়ে গৃহত্যাগী অভিমানীকে ফিরিয়ে আনতে। চেষ্টার ত্রুটি ছিল না মুরারীর। কিন্তু সে নাগালই পায়নি রতনের। কলকাতায় হস্টেলে রতন ফিরে যায়নি আদৌ। কলেজেও আসে না ক্লাস করতে। সাক্ষাৎ না পেলেও শেষ পর্যন্ত হদিস পেয়েছিল। সে বুঝি কোন ঠিকাদারের তরফে কাজ দেখতে ডিমাপুর চলে গেছে। খবর দিল ওর বন্ধুরাই। রাকেশ পারেখ মস্ত মিলিটারী কনট্রাক্টর। তাঁর ছেলে শশী পড়ত ওদের সঙ্গে। পারেখ-সাহেব যুদ্ধক্ষেত্রে কী সব ঠিকাদারীর কাজ ধরেছেন—দারুণ লাভের ব্যবসা—কিন্তু বিপজ্জনকও। রত্নেশ্বর দত্তকে ডিমাপুরে পাঠিয়ে তিনি কলকাতায় অর্থনৈতিক হাল ধরে বসে আছেন!

যুদ্ধের ক'বছর ছেলে ঘরে ফেরেনি। সে নাকি ডিমাপুর-কোহিমা অঞ্চলে ধুলিমুঠি ধরে সোনামুঠি করছিল তখন—আজাদ হিন্দ ফৌজকে রুখতে।

দেড় বছরেই লক্ষপতি। ছেলে ফিরে এল বিরাট ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নিয়ে। ঐ সঙ্গে আরও কিছু আনুষঙ্গিক দোষ—'ম'-কারান্ত।

থামল কালযুদ্ধ। শুরু হল দাঙ্গা। সেই সময়েই দেশে ফিরে এল কৃতি সন্তান। বেকার ছাত্র ততদিনে সুটেড-বুটেড, পাইপ-মুখো কণ্ট্রাক্টার-সা'ব। মফঃস্বল শহরের বুকে থেকে তখনও মুছে যায়নি সদ্যসমাপ্ত মন্বন্তরের বিভীষিকা—আকাশে-বাতাসে তখনও ভাসছে: 'মা রে! একবাটি ফ্যান দিবা?'

যজ্ঞেশ্বর হারানো ছেলে ফিরে পেলেন। বোধকরি কথাটা ঠিক নয়। তাঁর 'খোকন' আর এই 'দত্ত-সাহেবে'র মাঝখানে আশমান-জমিন ফারাক। যজ্ঞেশ্বর

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

খুশি হবেন কিনা বুঝে ওঠার আগেই ওপারের ডাক শুনলেন। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই চোখ বুজলেন একদিন।

সদ্যস্বাধীন এই মফঃস্বল শহরের একটি বিশেষ দিনের কথা ভুলতে পারে না মুরারীদা। যজ্ঞেশ্বর তার আগেই নিষ্কৃতি পেয়েছেন। বৌঠান তখনো পুজোঘরের চার-দেওয়ালের অন্তরালে আত্মগোপন করেননি। মা-জননীও তখন আসেনি এ সংসারে—মানে, রতনের স্ত্রী, সুছন্দা। স্বাধীনতার মুহূর্তে ঠিক মতো বুঝে ওঠা যায়নি এই জেলা-সদর শহরটা র‍্যাডক্লিফ-সাহেবের নিদান-মোতাবেক কার ভাগে পড়ল। সহস্রাব্দির সেই চিহ্নিত দিনটিতে তাই বাড়ির ছাদে-ছাদে দু-জাতের পতাকাই উড়ছিল পৎ পৎ করে।

তারপরে বোঝা গেল এ শহরটা পড়েছে স্বাধীন ভারতের এলাকায়। তার আগেই মিলিটারি ডিসপোজাল থেকে রত্নেশ্বর জীপ কিনেছে, বাড়িতে টেলিফোন বসিয়েছে। মায় দ্বিতল বানাতে শুরু করেছে—সেই নিঃ-সিমেণ্ট আকালের বাজারে। রতন বলত, টাকায় কী না হয়? আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটার আধুনিক নাম ঃ কালো টাকা!

শহরবাসীদের সঙ্গে তার দোস্তী হয়নি। ওর বাল্যবন্ধু বা স্কুলের সহপাঠীরা খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল। এতদিন পরে সেই রৎনাটা টাকার কুমির হয়ে ফিরে এসেছে। বেঁটে-বেঁটে জাপানীগুলোকে আর তাদের তাঁবেদার কুইসলিংগুলোকে ভারতে ঢুকতে দেয়নি। যুদ্ধ-প্রত্যাগত বীরের সম্মানই হয়তো দেখাতো তারা কিন্তু ওর নিরুত্তাপ উদাসীনতায় তারা একে একে নেপথ্যে সরে গেল। বুঝল, রতন দত্ত সেই পুরানো যুগকে ভুলে থাকতেই চায়। হয়তো ভাবে, ওরা এসেছে সময়ে-অসময়ে বন্ধুত্বের দাবীতে হাত পাতবার শুভেচ্ছা নিয়ে। ওর নয়া ইয়ারবন্ধুরা আসে কলকাতা থেকে। শনিবার সন্ধ্যায়। ফিরে যায় সোমবার প্রত্যুষে। ট্রেনে নয়, বাই রোড।

মদের বন্যা বয়ে যায় সে দুদিন। শুধু বন্ধু নয়, কিছু বান্ধবীও আসে যে!

সেই বিশেষ দিনটির কথা।

সেদিন সকালে ওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন শহরের দশ-বারোজন। দু-চারজন গণ্যমান্য—স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁরা জেল খেটেছেন, অসহযোগ আন্দোলন করেছেন, নির্যাতন সহেছেন—এখন নতুন করে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন। সেই দু-চারজনকে মধ্যমণি করে স্থানীয় যুবশক্তি—কলেজের

www.banglabookpdf.blogspot.com

ছোকরার দল।

কী ব্যাপার? কী চাই?

ড্রেসিং-গাউন পরে পাইপমুখো দত্ত সাহেব এত্তেলা পেয়ে দ্বিতল থেকে নেমে এসে জানতে চাইল। সুধীন্দ্রনাথ প্রবীন কংগ্রেস নেতা। বললেন, বস রতন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রতন বললে, কথা নিশ্চয়ই আছে, না-হলে সাত-সকালে আমার বাড়ি চড়াও হবেন কেন? কী জন্যে চাঁদা চাইতে এসেছেন তা বলতে হবে না। কত দিতে হবে সেটুকুই বলুন?

সুধীন্দ্রনাথ শহরের মানী ব্যক্তি। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। রতনের বাবার চেয়েও বয়সে বড়। তাঁর আশা ছিল, অন্তত তাঁর সামনে ও ছোকরা পাইপটা টানবে না। বুঝলেন, ধারনাটা ভুল। গম্ভীর হয়ে বললেন, না, চাঁদা চাইতে আসিনি আমরা।

—তাহলে? গরিবখানায় পদধূলি দেওয়ার হেতুটা?

—দেখ রতন, তোমার বাবাও আমাকে 'সুধীনদা' ডাকতেন। তোমার নাড়ি-নক্ষত্রের সন্ধান আমরা জানি। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এসেছ ভাল কথা, আনন্দের কথা। কিন্তু এটা কলকাতা নয়, এখানে থাকতে হলে তোমাকে চালচলন বদলাতে হবে।

পাইপের আগুনটা নিবে গিয়েছিল। লাইটার জ্বেলে সেটা ধরাতে ধরাতে রতন বললে, মানে?

—প্রতি সপ্তাহান্তে তোমার বাড়িতে দেখছি কলকাতা থেকে তোমার কিছু ইয়ার বন্ধু ও বান্ধবীরা আসেন। তারপর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত যে কাণ্ডটা হয় তাতে পাড়ার লোকের অসুবিধা হচ্ছে। তাঁরা বিরক্ত।

—নাকি? সেক্ষেত্রে তাঁরা এ-পাড়া ছেড়ে বেপাড়ায় চলে গেলেই পারেন?

হঠাৎ একটি অল্পবয়সী ছোকরা বলে ওঠে, অতগুলো মানুষের বাড়িবদল করার চেয়ে একা আপনার পক্ষে ঠাঁই বদল করাটা সহজ হবে না কি?

রতন রুখে ওঠে, মানে? কী বলতে চাইছ?

—দেখুন রতনদা, আপনি কীভাবে রাতারাতি লক্ষপতি হয়েছেন সে-কথা জানতে বাকি নেই আমাদের। কিন্তু সেসব ইংরেজ-জমানার ব্যাপার। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। এসব বেলেল্লাপনা আমরা সহ্য করব না। ইংরেজকে যেভাবে তাড়িয়েছি, প্রয়োজন হলে, তাদের চামচেদেরও সেভাবে 'কুইট-ইণ্ডিয়া'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

করে ছাড়ব।

হঠাৎ এরকম আক্রমণ হবে—তারই বাড়িতে, তারই বৈঠকখানায়—এটা রতন আশঙ্কা করেনি। রতনের একটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। সে খেয়াল করে দেখেনি—ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। যুদ্ধান্তে সে যেভাবে রণক্লান্ত সৈনিকের সম্মান পেয়েছিল এখন তার আর তা প্রাপ্য নয়। ইতিমধ্যে লালকেল্লায় আজাদহিন্দ ফৌজ দলের তিনজনের বিচার হয়ে গেছে! সে কথা খুঁজে পায় না।

দোরের কাছে তখন দাঁড়িয়ে ছিল মুরারীদা। হঠাৎ এক পা এগিয়ে এসে বললে, সুধীনদা, আমি কথা দিচ্ছি—ওসব বেচাল আর হবে না। আপনি দেখে নেবেন!

ছেলেটা ঘুরে দাঁড়ায়। আপাদমস্তক দেখে নেয় ঐ ছোট্টখাট্ট মানুষটাকে। তার মুখোমুখি হয়ে বলে, আপনি কে মশাই? আগ্‌ বাড়িয়ে কথা বলতে এসেছেন?

মুহূর্তে জ্বলে উঠল মুরারীদা। তার ছাব্বিশ-ইঞ্চি বুকটা চিতিয়ে বললে, তুমি কে হে হরিদাস পাল যে, তোমার কাছে আমার পরিচয় দিতে যাব? আমাকে চেনেন দা-ঠাকুর। তাঁর নাম শুনেছ? সেই যে, 'বিদূষক' গো!

সুধীনদা এগিয়ে এসে মুরারীর হাত দুটি ধরে বলে ওঠেন, তুমি রাগ কর না মুরারী—এসব ছেলে-ছোকরা তোমাকে চিনবে কী করে?

তারপর তাঁর ছাত্রবন্ধুদের দিকে ফিরে বলেন, এ হল মুরারী রায়—দা-ঠাকুরের প্রেসে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক ইস্তাহার ছেপে দিয়েছে আমাদের। মানীর সম্মান রেখে কথা বলতে শেখনি তোমরা?

মোটকথা, সেদিন একটা বিশ্রি পরিস্থিতি থেকে রতনকে বাঁচিয়েছিল ঐ মুরারী রায়। শুধু তাই নয়, অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে ওর জীবনের ছকটা সে আমলে কিছুটা পালটে দিতে পেরেছিল। অথচ দুর্ভাগ্য এমন যে, রতন সেজন্য ওর প্রতি কৃতজ্ঞ তো নয়ই, বিরক্ত। যেন মুরারীদাই ওকে অপমান করেছিল সেই সকালে। না হলে, সে দেখে নিত ওদের।

টাকায় কী না হয়?

টাকায় যে সবকিছু হয় না এ অভিজ্ঞতাটা কিন্তু রতনের হয়েছে; অন্তত হওয়া উচিত ছিল। না, হয়নি। কথাটা সে মেনে নিয়েছিল, মনে নেয়নি। ভেবেছিল—ও একটা ব্যতিক্রম; এক্‌সেপশন প্রুভস দ্য রুল!

বেয়াল্লিশ সালের ঘটনা।

যুদ্ধের মাঝামাঝি। রতনের সেদিন একটা বড় জাতের টেণ্ডার দেওয়ার কথা। এম. ই. এস.-এ। টেণ্ডার অবশ্য নিতান্ত নিয়মরক্ষা। কাজটা সে পাবেই। তলে তলে আগেভাগেই টাকা খাইয়ে রেখেছে ঘাটে ঘাটে। গ্যারিসন-এঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে তাঁর ডিভিশনাল হেড-এস্টিমেটার, স্টেনো, মায় সাহেবের আর্দালি পর্যন্ত। যাতে 'লোয়েস্ট' না হলেও কোন ছুতো-নাতায় তার টেণ্ডারখানাই গৃহীত হয়। বস্তুত টেণ্ডার গৃহীত হয়েছে ধরে নিয়ে ইতিমধ্যেই ইঁটের ভাঁটায় বায়না দেওয়া হয়ে গেছে। যুদ্ধের ডামাডোলে এটাই ছিল রেওয়াজ। আসামে একটা টেম্পরারি এয়ারস্ট্রিপ আর কিছু ইনফ্রা-স্ট্রাকচার বানানোর কাজ—পনের লক্ষ টাকার! দুপুর দুটোয় টেণ্ডার দাখিল করার শেষ মুহূর্ত। সাহেব টেণ্ডার খুলবেন তিনটেয়। কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে রতন বাড়ি থেকে রওনা হল বেলা দশটায়। কারণ ছিল। 'স্মল-কজ-কোর্টে' তাকে ঐ দিন বেলা এগারোটায় একবার হাজিরা দিতে হবে।

সে আর এক বখেড়া। দিন কয়েক আগে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে লালবাতির সংকেত অগ্রাহ্য করে তাকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। ওর জরুরী দরকার ছিল। সবসময় ট্রাফিক সিগন্যাল তো আর মানা সম্ভবপর নয়। বিশেষ রত্নেশ্বর দত্তের মতো ব্যস্ত মানুষের। ওয়্যার-এমার্জেন্সি বলে কথা! জীপের ভিয়ু-ফাইণ্ডারে নজর হয়েছিল, মোড়ের পুলিসটা তার গাড়ির নম্বর টুকে নিচ্ছে নোটবইতে। রতন মনে মনে বলেছিল, টোক বাবা, টোক! তোর কাজ তুই করে যা। দু-দশ টাকা ফাইন দেব; কিন্তু এই মুহূর্তে লালবাতির চোখ রাঙানি আমি মানতে পারব না বাপু!

আজই বেলা এগারোটায় সেই কেস্‌-এর হিয়ারিং। 'স্মল-কজ-কোর্ট'-এ হাজিরা দেবার ইচ্ছা ওর একেবারেই ছিল না। কিন্তু উকিলবাবু বললেন, তা হয় না স্যার। গাড়ি আপনার, লাইসেন্স আপনার নামে, চালাচ্ছিলেন আপনি, এখানে আমি কী করে আপনার হয়ে দাঁড়াব?

রতন বলেছিল, তাহলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে 'ডেট' নিন। আজ যে আমার টেণ্ডারের তারিখ!

উকিলববাবু ওকে আশ্বস্ত করেছিলেন, সে তো বেলা দুটোয়, স্যার! আপনি কিছু ভাববেন না। এ ব্যাপার শুধু পাঁচ-সাত মিনিটের। আমি দেখব, যাতে সবার আগে আপনার কেসের ডাক পড়ে। পাঁচ-দশটাকা ফাইন হবে, টাকা

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মিটিয়ে সোজা চলে যাবেন টেণ্ডার দাখিল করতে। তবে একটা কথা বলে রাখি স্যার—গিল্‌টি প্লীড করবেন, আর ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব যা জরিমানা ধার্য করবেন তা এক কথায় মেনে নেবেন। তর্কাতর্কি করতে যাবেন না, তাতে ফাইনের অংকটা বেহদ্দো বেড়ে যাবে।

রতন বিজ্ঞের মতো বলেছিল, জানি। ওখানে কাজির বিচার হয়। আপনি শুধু দেখবেন, সবার আগে যেন আমার কেসটা ওঠে। প্রয়োজনে বিশ-পঞ্চাশ-টাকা খাওয়াতে কৃপণতা করবেন না যেন।

পৌনে এগারোটার মধ্যেই আদালতে হাজিরা দিয়েছিল। বিচারক এলেন কাঁটায়-কাঁটায় এগারোটার সময়। সবাই উঠে দাঁড়ায়। উকিলবাবুর কনুইয়ের গোঁত্তা খেয়ে রতনও।

তারপর কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটল না! পেশকার যে নামটা দাখিল করল, কোর্ট-পেয়াদা প্রতিধ্বনি করল বাজখাঁই গলায়, সেটা 'রত্নেশ্বর দত্ত' নয়।

রতন বিরক্ত হয়ে উকিলবাবুকে বলে ওঠে, এ কী! আপনাকে এত করে বললাম…

উকিলবাবু ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, আস্তে স্যার, আস্তে। এর পরেই আপনার ডাক পড়বে। রত্নেশ্বরের বিস্ময়প্রকাশ কিছু সোচ্চার হয়ে থাকবে। অনেকেই ওদের দিকে তাকিয়ে দেখেছে। মায় বিচারক স্বয়ং।

দ্বিতীয় আসামীর নাম যখন ঘোষিত হল তখন দেখা গেল সে অন্য একজন ভাগ্যবান। এবারও রতন উকিলবাবুকে ধমক দিল, তবে চাপাকণ্ঠে। ম্যাজিস্ট্রেট আবার ওকে নজর করলেন। আশ্চর্য! রতন দত্ত তৃতীয় কিংবা চতুর্থ স্থানও দখল করতে পারেনি। রাগে মনে মনে ফুসছিল সে। উকিলবাবু এ বাবদ পঁচিশটা টাকা হাতিয়েছেন। যাতে সবার আগে ওর ডাক পড়ে সেই ব্যবস্থা করতে। পঁচিশ টাকার ভাউচার দেওয়ার তো আর প্রশ্ন ওঠেনি। রতন আন্দাজ করে ঐ পঁচিশ টাকা উকিলবাবু পকেটস্থ করেছেন। বড়জোর একটা কাঁচি সিগ্রেট খাইয়েছেন পেশকারকে। কোন মানে হয়? পনের লক্ষ টাকার টেণ্ডার যেখানে 'ইনভলভড্'…

ঘড়ির কাঁটা সাড়ে এগারোটার ঘরটা দেখাচ্ছে। রতন উশখুশ করছে, বারে বারে ঘড়ি দেখছে। রাগে, দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে তার—অথবা উকিলবাবুর চুলের এক মুঠি উপড়ে নিতে! পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করতেই উকিলবাবু হুমড়ি খেয়ে বাধা দেন, করেন কি স্যার! কোর্টের ভিতর

স্মোক করা বারণ! অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ—পৌনে বারোটায়। কোর্ট-পেয়াদা হাঁকাড় পাড়ে: রত্নেশ্বর দত্ত হা-জি-র?

গলার টাইটা ঠিক করে নিয়ে রতন উঠে দাঁড়ায় আসামীর নির্দিষ্ট মঞ্চে।

প্রসিকিউশনের তরফে কোর্ট-ইন্সপেক্টার প্রশ্ন করেন, আপনার নাম?

রতন বিরক্ত হয়ে বললে, এইমাত্র তো শুনলেন কোর্ট পেয়াদার হাঁকাড়ে। যে-নামে সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

—বাজে কথা একদম বলবেন না। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন। আপনার নাম?

—রত্নেশ্বর দত্ত।

—গত সতেরই জুন বেলা এগারোটা দশ মিনিটের সময় আপনি একটা জিপ ড্রাইভ করে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে…

রতন অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠে, হ্যাঁ স্যার। স্বীকার করছি! অপরাধ হয়ে গেছে। রেড-সিগনাল দেখতে পাইনি। বলুন, কত ফাইন দিতে হবে?

শেষ প্রশ্নটা বিচারকের দিকে ফিরে।

তিনি শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। প্রস্তরমূর্তির মতো বসেই রইলেন। তাঁর চোখ জোড়া ভাবলেশহীন—মরা পাবদা মাছের মতো। কোর্ট-ইন্সপেক্টার বললে, অভিযোগটা না শুনেই অপরাধ স্বীকার করছেন দেখছি। বারে বারে ঘড়ি দেখছেন—মনে হচ্ছে আপনার খুব তাড়া আছে। তাই নয়?

—তা আছে, স্যার। বলুন, কত ফাইন দিতে হবে?

—আগে অভিযোগটা শুনুন। তারপর তো গিল্‌টি কি না স্বীকার করবেন?

—বেশ, বলুন?—রতন রীতিমতো বিরক্ত।

—এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে একটি লোককে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছেন?

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় রতন! বলে, না তো! কে বললে?

—কেউ বলেনি। তাই বলছি, অভিযোগটা শুনে তারপর গিল্‌টি প্লীড করাই বুদ্ধিমানের কাজ। নয় কি?

আরও দু-চার মিনিট ধরে চলল, সওয়াল-জবাব। রতন এর মধ্যে আবারও একবার ঘড়ি দেখেছে। যাহোক, আদ্যোপান্ত শুনে সে দ্বিতীয়বার স্বীকার করল তার অপরাধ। বলল, তাড়াহুড়োয় লালবাতির সংকেতটা তার নজরে পড়েনি।

প্রসিকিউশান এবার বিচারককে জানায় তার সওয়াল শেষ হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট-

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সাহেব এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন, দেখা গেল, কী-জানি কেন তিনিও কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন ঐ ব্যস্তসমস্ত মানুষটির বিষয়ে। এক কথায় রায় না দিয়ে তিনি নিজেই এবার সওয়াল শুরু করেন, আপনি প্রসিকিউশানকে এইমাত্র বললেন যে, আপনার খুব তাড়া আছে। কিসের এত তাড়া ?

পকেট থেকে সীলমোহরাঙ্কিত লেফাফাটা বার করে রতন বিচারককে দেখায়। বলে, এম. ই. এস্-এ একটা টেণ্ডার দিতে হবে স্যার। বেলা দুটোর মধ্যে।

—'এম. ই. এস' মানে মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ?

—ইয়েস স্যার।

—আপনি বুঝি মিলিটারি ঠিকাদার ?

কোনও মানে হয় ? তোর এসব খেজুরে-গপ্পে কী-কাজ ? প্যাণ্টলুন যেটা পরে এসেছিস সেটা তো নির্ঘাৎ চাঁদনি থেকে রেডিমেট কেনা।

রতন সবিনয়ে স্বীকার করল, হ্যাঁ স্যার।

—কত হাজার টাকার টেণ্ডার ওটা ?

—হাজার নয়, লাখ্। পনের লক্ষ টাকার টেণ্ডার—আসলে একটা এয়ারস্ট্রিপ বানানোর কাজ। ওয়্যার এমারজেন্সি ! এবার বলুন স্যার, কত ফাইন দিতে হবে ?

বারে বারে অনুরুদ্ধ হয়েও বিচারক সে-কথা বলছেন না। এবার তিনি যে প্রশ্নটা করলেন তার সঙ্গে ওর অপরাধ সম্পর্কবিমুক্ত ! বলেন, পনের লক্ষ টাকা ! বলেন কি ! কাজটা পেলে কত টাকা প্রফিট থাকবে মনে করেন ?

রতনের মনে হল জবাবে বলে, ইররেলিভ্যাণ্ট, ইম্মেটিরিয়্যাল অ্যাণ্ড অ্যাবসার্ড ! কিন্তু উকিলবাবুর সতর্কবাণী স্মরণ করে সে ধৈর্যচ্যুত হল না। বললে, ফেয়ার-ডীলে ধরুন টেন পার্সেণ্ট।

—মানে প্রায় দেড় লাখ্ ! আর আনফেয়ার ডীল হলে ?

রতন হাসল। রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিয়ে বললে, সেটা কি স্যার হলপ নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলা যায় ?

হাসিতে নাকি হাসি আনে। প্রবাদবাক্যটা এক্ষেত্রে সার্থক হল না। বিচারক একদৃষ্টে ওর দিকে শুধু তাকিয়েই রইলেন। যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। রতন হিপ-পকেট থেকে ভারি ওয়ালেটটা বার করে বললে, আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করেছি। আর করব না। বলুন স্যার, কত টাকা ফাইন দিতে হবে ?

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিচারক বাকশক্তি ফিরে পেলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, গিল্টি। টু বি ডিটেইনড্ টিল রাইজিং অব দ্য কোর্ট !

হতভম্ব রতন শুধু বললে, মানে ?

ইতিমধ্যে একজন সেপাই এসে আলতো করে ধরেছে ওর দক্ষিণ বাহুমূল। বললে, আপনার কেস হয়ে গেছে। এবার নেমে আসুন।

পেশকার পরবর্তী আসামীর শুভনাম ঘোষণা করল। রত্নেশ্বর কিন্তু মঞ্চ থেকে নেমে এল না। পুনরুক্তি করল, এর মানে কী ?

কোর্ট-ইন্সপেক্টার বুঝতে পেরেছে বিচারকের সূক্ষ্ম রসিকতাটুকু। সহাস্যে বললে, আপনাকে হুজুর ফাইন করেননি। আদালত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে ঐখানে চুপটি করে বসে থাকতে হবে ! আসুন, নেমে আসুন।

তবু স্থানত্যাগ করল না রত্নেশ্বর। জানতে চায়, কতক্ষণ ? কতক্ষণ বসে থাকতে হবে ?

—যতক্ষণ হুজুর আদালতে থাকবেন।

রত্নেশ্বর এবার বিচারকের দিকে তাকায়। আশ্চর্য ! মরা পাবদামাছের চোখজোড়া যেন চিক্‌চিক করছে এতক্ষণে। রতন বুঝতে পারে, লোকটা শয়তানি করছে ! গম্ভীরভাবে বিচারকের কাছে জানতে চায়, সে-ক্ষেত্রে আমি আমার উকিলবাবুকে এই টেণ্ডারখানা দিতে পারি ?

ম্যাজিস্ট্রেট ভিজে-বেড়ালটি। সাড়া দেন না। কোর্ট-ইন্সপেক্টারই আইনের শাঙ্করভাষ্য দাখিল করে, না, পারেন না। আপনি, ইনফ্যাক্ট, এখানে বন্দী। কয়েক-ঘণ্টা বিনাশ্রম জেল খাটছেন। বুঝেছেন ?

রত্নেশ্বর রুখে ওঠে, কিন্তু বন্দী অবস্থায় আমি আমার লীগাল কাউন্সেলারের সঙ্গে কেন কথাবার্তা বলতে পারব না ?

—কে বলেছে পারবেন না ? ঐ বেঞ্চিতে বসে যত ইচ্ছে খোশগল্প করুন না আপনার উকিলবাবুর সঙ্গে। কিন্তু সেই সুবাদে বন্দী অবস্থায় আপনি কোন সীলমোহর করা লেফাফা এই আদালত কক্ষের বাইরে পাঠাতে পারেন না। আমরা সীল ভেঙে দেখব খামের ভিতর কী আছে। সেটা আমাদের এক্তিয়ারভুক্ত—বিশ্বাস না হয়, আপনার উকিলবাবুকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন। আর বুঝতেই পারছেন, সীল ভেঙে ওটা পরীক্ষা করতে সময় লাগবে। আসুন স্যার, এবার নেমে আসুন। চুপটি করে গিয়ে বসুন ঐ কাঠের বেঞ্চিটায়।

রতন জানে না, সেদিন দুপুরে আদালত-সংলগ্ন ক্যান্টিনে চায়ের কাপে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তুফান উঠেছিল। প্রবীণ উকিলবাবুরাও তাঁদের পাকাচুলে বা ফাঁকাচুলে ভরা মাথা নেড়ে স্বীকার করেছিলেন—স্মলকজ কোর্টে দেড় লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড একটা বিশ্বরেকর্ড !

কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে—আবার কেউ কেউ চোখে খোঁচা খেয়েও দেখে না, শেখে না। মিলিটারি জমানার ঐ কয় বছরের অভিজ্ঞতায় ওর ধারণা হয়েছিল যে, টাকায় সব কিছু হয়—'রেডি মানি ইজ আলাদীনস্ ল্যাম্প' ! শুধু তাই না, অর্থই পরমার্থ ! এ দুনিয়ার সব কিছু—হাসি-কান্না, ভালো-মন্দ, মায় হার্দিক অনুভূতি পর্যন্ত মাপা যায় অর্থনৈতিক তুলাদণ্ডে। বাপ-মা সন্তানকে ভালবাসে। কেন? তারা আশা রাখে বুড়ো বয়সে সন্তান তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব নেবে। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে—তারই রোজগারে যে ওর অশন-ব্যসন তথা ফুটানি-কি-বটুয়ার রবরবা ! স্বামীও ভালবাসে স্ত্রীকে—সে ওর ঘরদোর গুছিয়ে রাখে, ব্যয় সঙ্কোচের এন্তাজাম করে !

তা হোক, তবু দেশ স্বাধীন হবার পর রতন নিজেকে কিছুটা সামাল দিয়েছিল। নৈতিক হেতুতে নয়, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা বাধ্য হয়ে। ওর কলকাতাবাসী কাপ্তেন ইয়ারবন্ধুরা—যারা ওরই মতো যুদ্ধের ডামাডোলে রাতারাতি লক্ষপতি হয়েছে, তারা ক্রমশ দূরে সরে গেল। সপ্তাহান্তের এই 'মধুচক্রে' তারা আর ভেড়ে না। কেউ কারণ দেখালো—কাজের চাপ, কেউ বললে সপ্তাহান্তে ঘোড়দৌড়ের মাঠটা টানতে থাকে। রতনের প্রথমটা ধারণা হয়েছিল—ওরা ঘাবড়ে গেছে। পরে আবিষ্কার করে—না, তা নয়, ওদের এই অমৃতে-অরুচির অন্তরালে আছে সেই খর্বকায় বটুর বদমায়েশী ! কে জানে, হয়তো পিছন থেকে ইন্ধন জুগিয়েছেন রতনের গর্ভধারিণী। মোট কথা জানা গেল, মুরারীদা কলকাতায় গিয়েছিল ; জনে জনে জনান্তিকে সাবধান করে দিয়ে এসেছিল রাতারাতি, 'উলট-পুরানে'র জমানা এসে গেছে।

'ও পাকে যিব তো ডাণ্ডা খিব !'

কাপ্তেন বাবুরা সহজেই বুঝলেন। মফঃস্বলের ছেলে তো—এখনো 'মড' হয়নি। 'ওল্ড ভ্যালুজ' আঁকড়ে পড়ে আছে। সোজা কথায়, পাড়ার ছেলেরা ওঁদের উত্তম-মধ্যম দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

সদ্যস্বাধীন দেশে কালো টাকার ফলাও ব্যবসাটা চালিয়ে যেতে সাহস পেল না। তখনো ব্যবসার বাজারটা 'কালোয় কালো ময় করে হে এলে কালোর

www.banglabookpdf.blogspot.com

কালো' হয়ে ওঠেনি। যুদ্ধ, মন্বন্তর আর দুর্ভিক্ষের কল্যাণে যাঁদের ব্যাঙ্কভল্টে মা-লক্ষ্মী বন্দিনী হয়েছেন তাঁরা উশখুশ করতে শুরু করেছেন। ব্যাঙ্কভল্টও যেন যথেষ্ট নিরাপদ নয়—না, চোর-ডাকাত-আগুন নয় ঃ দুর্নীতি দমন বিভাগ : ভিজিলেন্স ! কেউ স্টেনলেস-স্টীলের আধারে মাটির নিচে মা-লক্ষ্মীকে টাইম-ক্যাপসুলে দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদে বন্দিনী করতে উন্মুখ ; কেউ বিশ্বস্ত রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে বাথরুমে ফল্‌স সিলিঙ বানানোতে ব্যস্ত। অর্থাৎ কৃষ্ণমুদ্রার বিনিয়োগের প্রশ্নটা চাপা পড়েছে সাময়িকভাবে, সেটাকে সংরক্ষণ করাই এখন প্রধান সমস্যা। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যে তখনো ঠিক মতো বাজিয়ে নেওয়া যাচ্ছিল না। অনেকেই জেল খেটেছেন, নির্যাতন সহেছেন, সাগরেদি করে এসেছেন এতদিন সেই সব অবিস্মরণীয় শহীদদের—'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।'

তাঁদের গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, পরনে খাদির ধুতি, পায়ে চপ্পল, চলা-ফেরা করেন ট্রামে-বাসে। আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটা তুলে ধরে তাঁদের মুখে কী জাতের আলোক-বিচ্ছুরণ হয় তা পরীক্ষা করে দেখার হিম্মৎ ছিল না ধনকুবের ব্যবসায়ীদের। 'বেওসা'য় যাঁদের পাকামাথা—দু-কুড়ি-সাতের খেলায় পোক্ত, তাঁরাও রতনকে পরামর্শ দিলেন ঃ দু-পাঁচ বরিস সমালকে রহেন দত্তা-সা'ব। নয়া-দেওতাদের ধ্যানমে রাখেন, দহরম-মহরম মচান, ঔর পার্টি-ফাণ্ডমে রোপেয়া লাগান, আখেরে ডিভিডেণ্ট দিবে !

প্রথমে সে-পথেই অগ্রসর হচ্ছিল। পরে ঠিকাদারী ব্যবসাটা গুটিয়ে নিল। উপায় নেই। কাউকে বিশ্বাস হয় না !

পি ডাবলু ডি., এম. ই এস, সি. পি. ডাবলু ডি., রেলওয়ে—সর্বত্রই যেন এক ঝাঁক যুধিষ্ঠিরের বাচ্ছা এসে জাঁকিয়ে বসেছে। সদ্য-স্বাধীন দেশের সদ্য-পাশ সব এঞ্জিনিয়ার। পূর্বযুগের ঘাঘী অফিসারেরাও সামলে সুমলে চলছেন। এ জাতীয় পরিবেশে ঠিকাদারী করা যায় না—অন্তত রত্নেশ্বর দত্তের অভ্যস্ত পথে। অগত্যা কণ্ট্রাক্টারি ব্যবসাটা গুটিয়ে ফেলল ! বাপের আমলের ছাপাখানাটা ছিলই। সেটাকে সম্প্রসারিত করল, নতুন কেতায় সাজালো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই হাড়-জ্বালানো মানুষটাকে তোয়াজ করতে হল।

কালো টাকা সে যে কোথায় সরিয়ে ফেলল সে-কথা জানত সে একাই। এমন কি সুচন্দা এ সংসারে আসার পরেও তার হদিস পায়নি। পাবে কোথা থেকে? ততদিনে 'হিন্দু-ম্যারেজ অ্যাক্ট' পাশ হয়ে গেছে যে ! আজ যে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তোমার গৃহলক্ষ্মী—একগলা ঘোমটা টেনে তোমার সন্তানকে স্তনদান করছে, তোমার জামায় বোতাম লাগিয়ে দিচ্ছে, নিষুতি রাত পর্যন্ত তোমার ভাত আগলে ঢুলছে, কাল সেই মেয়েটিই হঠাৎ খর্পরধারিণীতে রূপান্তরিতা হয়ে যেতে পারে। আদালতের মাধ্যমে তোমার নামে সমন ধরাতে পারে। তখন জোড়া-পাঁঠায় মা চামুণ্ডার মন না উঠলে মহিষীবলি-'অ্যালিমনি'র ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় শেষ রাতে রেইড হবে তোমার ভদ্রাসন। তোমার বেডরুম-সংলগ্ন বাথরুমের ফল্স সিলিঙ উপড়ে ফেলবে চামুণ্ডার চেলা-চামুণ্ডা!

তাই সুছন্দাকে কিছু জানায়নি। সে অবশ্য কৌতূহলও দেখায়নি। জানতে চায়নি, কোথায় সুরক্ষিত আছে গুপ্তধনটা। সে শুধু এটুকুই বুঝতে পেরেছিল, কালীতারা প্রেসের উপার্জন থেকে এ সংসারের চাহিদা মেটেনা। ওর স্বামীর উপার্জনের রাজপথ: 'ভেনাস ট্রাভেলস'।

কলকাতা-দিল্লি-বোম্বাইয়ে তার শাখা-অফিস। প্রাইভেট লিমিটেড ট্রাভেল-এজেন্সি। রত্নেশ্বর দত্ত তার শেয়ারের বৃকোদরভাগ দখল করেছে। কিন্তু রতন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নয়, সে কাজ চালায় ওর নির্বাচিত প্রতিনিধি। সে হিসাবে রত্নেশ্বর সিনিয়ার শ্লিপিং পার্টনার। জুনিয়ার পার্টনারের নামটা জানতে জানতেই সুছন্দার কোলে এসেছে: ঋদ্ধি!

পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে বিদেশযাত্রার আয়োজন ছিল একটা লাভের ব্যবসা। কৃতি ছাত্ররা দলে দলে চলেছে য়ুরোপ, 'ম্যারিকা—টুপিতে সাতরঙা পালক গোঁজার বাসনা নিয়ে। শুধু কৃতি ছাত্রই নয়, নিতান্ত গোলা-মার্কার দলও চলেছে দলে দলে—ঐ যাদের মুরুব্বির জোর আছে। অর্থাৎ যাদের মামা-মেসোরা এককালে খদ্দর পরতেন, জেল খাটতেন, বছর কয়েক আগেও যাঁদের ট্রামে বাসে যাতায়াত করতে দেখা যেত। এ ছাড়াও আছে প্রমোদভ্রমণের হিড়িক—ঐ যাঁরা রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দৌলতে। হোক বিলেত দেশটা মাটির, তবু সেদেশের সিনেমা-স্ক্রীন সাদা-কালোর নয়—না, মাল্টি-কালার বলেও নয়, তার রঙ 'নীল'!

যা এই 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'-এ দুর্লভ!

রতন সব কিছুই পেয়েছে জীবনে। অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান, সুন্দরী-শিক্ষিতা সহধর্মিণী, সাজানো সংসার। ইচ্ছে করলে ইলেকশানে দাঁড়াতে পারত—বিধানসভা আলো অথবা কালো করে বসতে পারত—কিন্তু সে বাসনা

তার কোন দিনই হয়নি। দু-তরফ থেকেই নমিনেশনের অফার এসেছিল। প্রত্যাখান করে। ওসব ঝামেলা তার পোষাবে না। মদটা ত্যাগ করেনি—কিন্তু সেটা পরিমিতি-বোধে সীমিত। পূর্ব-জমানার ইয়ারবন্ধুরা দূরে সরে গেল—নতুন জমানার মানুষজনের সঙ্গে তার দোস্তি হল না। নিমে দত্তের সেই দার্শনিক উক্তিটি ওর জীবনে সার্থক হয়নি: একটি বড়লোকের ছেলে মদ ধরলে পাঁচটি মাতালের প্রতিপালন হয়।'

রতন মদ্যপান করত। একাই। রুদ্ধদ্বার কক্ষে। নিত্য রাত্রে। আড়াই পেগ মাপা স্কচ। সুছন্দার চোখের সামনে, তারই ব্যবস্থাপনায়।

সর্বদিক থেকেই পরিপূর্ণতা।

তবু কোথায় যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।

সুছন্দা বদলে গেছে। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেই!

সে যেন আর সেই আগের মতোটি নেই।

'এক্সেপ্শান প্রুভস্ দ্য রুল'—প্রবাদবাক্যটা প্রমাণিত করলেই যেন মেনে নিতে হল: আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের নাগালের বাইরেও কিছু থাকতে পারে!

হ্যাঁ, আছে: 'মেয়ে-মন'!

সব কিছুরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। অবশ্য সুছন্দার পরিবর্তনের হেতুটা অবোধ্য হয়—সেটা বোঝা যায়। যেদিন থেকে সুছন্দা হারিয়েছে স্বামীর উপর অসপত্ন অধিকার সেদিন থেকেই সে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

কিন্তু ঋদ্ধিটা?

সে কেন বাপের ইচ্ছানুসারে গড়ে উঠল না! একটি মাত্র সন্তান—কিন্তু সেও যেন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। প্রথম থেকেই নয় কিন্তু।

একেবারে শৈশবে—যা হবার নয় তাই হয়েছিল—মায়ের চেয়ে বাপের প্রতিই ছিল তার টান। রতন যতক্ষণ অন্দরমহলে, ছেলেটা তার লগে লগে! বোল ফুটতে শুরু করল 'বা' বলে, 'মা' নয়! আশ্চর্য! একটু বড় হতেই দেখা গেল মায়ের বিরুদ্ধে তার হাজারো অভিযোগ: বাপি, দেখ মা আমাকে বকেছে! বাপি, মা আমাকে আইসক্রীম খেতে দিচ্ছে না! মা দুষ্টু! তুমি মাকে বকে দাও!

সুছন্দা বলত: ছেলে তোমার বাপ্-চেংটা! রতন দিবারাত্র মেতে থাকত ছেলেকে নিয়ে। নানান ছবির বই কিনে আনত। বাপ-বেটায় বসে বসে পাতা

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

উলটাতো। সেভেন ডোয়ার্ফ, বাম্বি, ডাম্বো, লিটল মার্মেড! বাপের বিছানায় গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত। দক্ষিণের বারান্দায় বাপ করে আণ্ডারহ্যাণ্ড বল, আর বেটা হুক করে পাতৌদি-স্টাইলে! কতবার ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়েছে কাচের সার্সি! ছুটে এসেছে সুছন্দা অথবা তার শাশুড়ী। রতন ঠারে ঠারে হাসত। পাগলাটার কাণ্ড দেখে। ব্যাট ফেলে দিয়ে পাতৌদি তখন টুমটুম হয়ে বসে পড়েছে ক্রীজে—আধ ইঞ্চি পরিমাণ লাল-টুকটুকে জিবের ডগাটুকু বেরিয়ে আছে শুধু!

কিন্তু এ সুখ সইল না ওর কপালে।

কেন? কেন? কেন?

ঐটুকু ছেলে—ও তো বোঝে না কিছু। ও তো জানে না—কেন ওর একটা ছোট ভাই বা বোন এসে হাজির হয়নি এত দিনেও, এই সংসারে!

কিন্তু কী-জানি কী বুঝে সে তিল তিল করে সরে গেল বাপের ছত্রছায়া থেকে মায়ের পক্ষপুটে। যেন জার্সি বদলালো! আট-দশ বছর বয়স হবার পর সে আর বাপের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথাই বলত না। আর কটা কথাই বা সে বলে সারাদিনে? নিজে থেকে একটাও নয়। প্রশ্ন করলে জবাব দেয়—তাও মাটির দিকে তাকিয়ে।

অথচ লক্ষ্য করে দেখেছে—ঋদ্ধি স্বভাবগম্ভীর নয় আদপে। মায়ের সঙ্গে, দিদার সঙ্গে, বামুনদি, ইন্দ্র পাঁড়ে, এমন কি মুরারীদাদুর সঙ্গে তার ক্রমাগত বক্‌বকানি। শুধু বাপকে দেখলেই কেমন যেন সিঁটিয়ে যায়।

কেন? সে তো জানে না মীনার ব্যাপারটা। জানতে পেরেছিল ঋদ্ধির মা। 'ভেনাস ট্র্যাভেলস'-এর ভেনাসের গোপন কথাটা।

মীনা পারেখ।

মড মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল—সন্তানাদি হয়নি। স্বামীত্যক্তা! না ভুল হল, মীনাই স্বামীকে ত্যাগ করে চলে এসেছিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা অবশ্য নিতান্ত অর্থনৈতিক প্রয়োজনে। শশী পারেখ ছিল রত্নেশ্বর দত্তের সিনিয়ার পার্টনার—যুদ্ধের আমলে, যখন ওরা ঠিকাদারি করত। মীনা ছিল যুদ্ধের ক-বছর শশীর পোষাকী ও পোশাকী স্ত্রী—অর্থাৎ কন্ট্রাক্ট আদায়ের টোপ। রতনের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—শশীর জ্ঞাতসারে। তাতে দোষ ধরেনি শশী। সে জানত যুদ্ধান্তে তারা পৃথক হয়ে যাবে—বস্তুত মীনা ওর বৈধ স্ত্রী ছিল না। তাই হল। যুদ্ধশেষে সব কিছু বেচে দিয়ে শশী পারেখ চলে গেল

www.banglabookpdf.blogspot.com

জুরিখে। সেখানে সে বিয়ে করেছে, সংসার করছে। মীনা তার লভ্যাংশটা বুঝে নিয়ে সদ্যস্বাধীন ভারতে খুলে বসল একটা ট্রাভেল এজেন্সি।

রতন হল তার স্লিপিং পার্টনার।

উভয়ার্থেই!

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন ছিল।

মায় মুরারী রায় পর্যন্ত টের পায়নি। রতন যে 'ভেনাস ট্রাভলস'-এর অন্যতম কর্ণধার একটু জানত। তার নামে মোটা-মোটা শেয়ার ডিভিডেন্ট আসত বলে। মাঝে-মাঝে রতনকে হিল্লি-দিল্লিও দৌড়াতে হত—কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের মীনা পারেখকে মুরারীদা চিনত না।

সুছন্দাও তার কথা জানতে পারেনি প্রথম বছর পাঁচেক।

নিতান্ত ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়—মানে, শুধুমাত্র সুছন্দার কাছে। আর সেদিন থেকেই মুরারীদার 'মা-জননী' আমূল বদলে গেল। রাগারাগি, চেঁচামেচি আদৌ করেনি—এমন কি শান্ত প্রতিবাদও নয়। এক কথায় যেন মেনে নিল—তার হার হয়েছে। সংসারের চাকায় যথানিয়মে তার পরেও মবিল জুগিয়ে গেছে। স্বামীর জামায় বোতাম লাগিয়ে দিয়েছে, শাশুড়ীর পুজোর যোগান দিয়েছে এবং ছেলের হোমটাস্ক। নতুন পর্দা কিনে এনে ঘর সাজাতো, ফুলদানিতে ফুল সাজাতো, এমন কি সন্ধ্যাবেলায় বামুনদিকে দিয়ে যথারীতি ভেট্‌কির ফ্রাই বানিয়ে মদের চাট যোগান দিত।

পরিবর্তন যেটুকু তা অন্দরমহলে নয়, অন্তরমহলে। বাহ্য পরিবর্তন নিতান্ত সামান্য—সুছন্দা ছেলেকে নিয়ে পাশের ঘরে শুতে শুরু করল।

রতন জানতে চায়নি তার কারণটা কী? তার সাহস হয়নি।

ঋদ্ধি তখনো নিতান্ত শিশু। এই সামান্য পরিবর্তনটুকু তার খেয়াল হবার কথা নয়। তবু···ক্রমে সে আরও বড় হল। তখনও সে কিছু বুঝত কি না কে জানে, একদিন নিজে থেকেই বলল, মা, আমি কাল থেকে পশ্চিমের ঐ ঘর-খানায় শোব। রাত জেগে পড়াশুনা করতে হয় আমাকে। চোখে আলো লাগলে তোমার ঘুম হবে না।

সুছন্দা প্রথমটা রাজি হয়নি। পরে তাকে মেনে নিতে হল। কারণ রাত জেগে পড়ার জন্য ওর একটি বন্ধুও আসতে শুরু করল: যতীন সোম। ওদের ক্লাসের সেরা ছেলে—তার পৃথক পড়ার ঘর নেই। গরিবের ছেলে, রাত জেগে পড়লে বাবার অসুবিধা হয়—তিনি ইনসমনিয়ার রুগী। যতীন সন্ধ্যারাত্রেই

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

চলে আসত এ-বাড়ি। রাতে এখানেই খেত আর গভীর রাত পর্যন্ত দু'বন্ধুতে পড়াশুনা করত। সে বছর ওরা হায়ার সেকেন্ডারি দেবে।

কতদিন মাঝরাতে সুছন্দা এসে দেখেছে ওরা দুই বন্ধু পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখের উপর জ্বলছে ইলেকট্রিক বাতিটা। সুছন্দা আলো নিবিয়ে, বই খাতা গুছিয়ে দিয়ে নীরবে ফিরে গেছে তার ঘরে। একক শয্যায়।

পাশের ঘরখানা রতনের। মাঝে পার্টিশান দেওয়ালে দরজা। ইদানিং সেটা এপাশ থেকে বন্ধ থাকে। রতন সে দরজায় আজকাল আর টোকা দেয় না।

অনেক—অনেকদিন আগে একবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল সুছন্দার। তখনো ঋদ্ধি শিশু মাত্র। বলেছিল, এ কী শুরু করেছ সুছন্দা? এভাবে তো তোমার-আমার দীর্ঘ বাকি জীবন কাটবে না?

—কেন? কাটবে না কেন? দু-মাস তো দিব্যি কেটে গেল। আমার তো কিছু অসুবিধা হচ্ছে না।

—আমার হচ্ছে।

—হওয়ার কথা নয়। শারীরিক প্রয়োজন থাকে তাহলে দু-চারদিন কলকাতা ঘুরে আসতে পার।

দাঁতে দাঁত চেপে রতন বলেছিল, তুমি মীনাকে সহ্য করতে পার না, তাকে ঈর্ষা কর! তাই নয়?

—না। তাকে ঈর্ষা করতে যাব কোন্ দুঃখে?

—তাহলে তাকে মেনে নিতে পারছ না কেন?

—মেনে তো নিয়েছি। বাধা তো দিইনি, আপত্তি তো করিনি। যাও ক'দিন কলকাতা ঘুরে এস বরং।

রতন সে রাত্রে আড়াই পেগ-এ ক্ষান্ত হতে পারেনি; বেশ কিছুটা নেশাগ্রস্ত হয়েই এ ঘরে এসেছিল। তাই বেমক্কা মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল—মীনা এখন কলকাতায় নেই!

—ও, তাই বুঝি? তা কলকাতায় টাকার বিনিময়ে নারীদেহ তুমি সহজেই যোগাড় করতে পারবে। টাকায় কী না হয়? যাও এখন, আমার ঘুম পাচ্ছে! আমাকে নিষ্কৃতি দাও!

রতন এগিয়ে এসে ওর বাহুমূল চেপে ধরেছিল। বলেছিল, তুমি…তুমি ভেবেছ কী?

সুছন্দা প্রতিবাদ করেনি। বলেছিল, আগে তো তুমি এমন কৃপণ ছিলে

www.banglabookpdf.blogspot.com

না? বিনা-পয়সায় বলাৎকার করতে চাও? চল তাহলে—ও ঘরে চল!

—বলাৎকার!—রতনের মুঠি আলগা হয়ে গেছিল।

সুছন্দা বলে, আভিধানিক অর্থটা তো তাই বলে—'ইচ্ছার বিরুদ্ধে নারীদেহ সম্ভোগ!'

রতন মাথা নিচু করে নিজের ঘরে ফিরে যায়। অথচ এই সুছন্দাকে সে নিজে দেখে, পছন্দ করে বিয়ে করে। ভালবেসেই।

যজ্ঞেশ্বর মারা যাবার বছর দুই পরের কথা। রতনের মা সে-আমলে হপ্তায় দু-তিনখানা চিঠি পান—চেনা-অচেনা মহল থেকে। তাঁর উপার্জনক্ষম উপযুক্ত পুত্রকে পাত্র হিসাবে প্রার্থনা করে। মাঝে মাঝেই তিনি আসতেন চিঠি নিয়ে, ফটো নিয়ে: কোনদিন আছি, কোনদিই নেই, তোকে সংসারী দেখে যেতে না পারলে মরেও আমি শান্তি পাব না।

রতন বলত, কে বলছে তোমাকে মরতে? আরও বিশ-পঁচিশ বছর বাঁচবে তুমি!

—কিন্তু বিশ-পঁচিশ বছর পর, তুই যে পঞ্চাশ পেরিয়ে যাবি খোকা!

—ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তো বলিনি যে, বিয়ে করব না। তবে এখন নয়…

তারপর একদিন।

মা এসে হাজির হলেন অন্য এক জাতের আবদার নিয়ে: আমি কালীঘাটে পুজো দিতে যাব, তুই নিয়ে যাবি খোকা?

রতন অবাক হয়। বলে, কেন? মুরারীকাকা গেলে হয় না?

—না, হয় না। তা যদি হত, তাহলে মুরারী ঠাকুরপোকেই ডেকে পাঠাতুম।

—তাই বল! তোমার আসল মতলবটা কী?

—নিবারণ ঘোষকে মনে আছে তোর? ডাক্তার নিবারণ ঘোষ? বোম্বাইয়ের?

—তা আছে। চেহারাটা মনে নেই, তবে নামটা অপরিচিত নয়। ডাক্তার ঘোষ ছিলেন যজ্ঞেশ্বরের সহপাঠী। বাবার শ্রাদ্ধে তাঁর নিমন্ত্রণ হয়েছিল, তাঁর চিঠিও পেয়েছিল। বললে, কেন বলতো?

—ঘোষমশাই গত হয়েছেন বছর খানেক আগে। তাঁর স্ত্রীকে মনে নেই? —তোর পারুলমাসি? ওরা এখন কালীঘাটের সাবেক বাড়িতে থাকে। তার ওখানেই উঠব, একটি বেলা থাকব; পুজো দেব, ফিরে আসব। এই ব্যাপার! বুঝলি?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

—আদৌ নয়। সেক্ষেত্রে মুরারীকাকার সঙ্গে তোমার কলকাতা যাওয়ার অসুবিধাটা কোথায় ?

যেন টোয়েণ্টি নাইন খেলছেন। এবার 'রঙ'টা দেখাতে হল। তুরুপের তাসটা। স্বীকার করলেন, রতনের ঐ পারুলমাসির একটি অনূঢ়া কন্যারত্ন বর্তমান। ডাকসাইটে সুন্দরী। বি. এ. পাস। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। পারুল-মাসি তার সঙ্গে রতনের সম্বন্ধ এনেছেন। অর্থাৎ শুধু রথ-দেখা নয়, কলা-বেচাও এই তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য। ভদ্রঘরের মেয়েকে তো বারে বারে দেখা যায় না—একবার মা, একবার ছাঁ ; রতন যদি রাজি হয় তাহলে এক ঢিলে দুটি পাখি মারা যায়।

রতন স্বীকৃত হয়নি। বলে, কেন এসব উটকো ঝামেলা করছ মা ? কালীঘাটে পুজো দিতে চাও তো যাও। ঐ ফাঁকে পারুলমাসিকে বলে এস, ছেলে এখন বিয়ে করতে চায় না।

—ছন্দার কথা তোর একদম মনে নেই, না রে ? তুই তো তাকে দেখেছিস ? ওরা যেবার এখানে আসে—দিন-সাতেক ছিল এ-বাড়িতে। তুই তখন খুব ছোট।

এতক্ষণে মনে পড়ে যায়।

হ্যাঁ, অনেক-অনেকদিন আগেকার কথা। রতনের বয়স তখন বছর আট-দশ। বোম্বাই থেকে বাবার এক বন্ধু এসেছিলেন বটে। সস্ত্রীক। আর সঙ্গে ছিল একটা হাড়-ডিগডিগে বিচ্ছু মেয়ে। কত বয়স ? বছর চার-পাঁচ। রোগা, মাথায় লাল রিবনের বো বাঁধা। দারুণ ফর্সা মেয়েটা। আর কথা বলত মুখ বেঁকিয়ে। বোম্বাইয়ের সবকিছুই ভাল—বোম্বাই আম, বোম্বাই ভেলপুরী, বোম্বাইয়ের জুহু বীচ, অ্যাকোয়ারিয়াম ! আছে তোমাদের কলকাতায় ? ফুঃ !

বিশেষ করে মনে পড়ল—দলবেঁধে বারোদোলের মেলায় বেড়াতে যাবার কথা। এ শহরে বছরে একবার বারোদোলের মেলা হয়। রাজবাড়িতে। বিরাট মেলা—হাজারো দোকানের রোশনাই। তার সঙ্গে সার্কাসের তাঁবু, ভানুমতীর খেল, এক মানুষের দুটো মাথা, মাকড়শা-মানুষ ! রতনদের বয়সী ছেলে-মেয়েরা সারা-বছর মুখিয়ে থাকত বারোদোলের মেলার প্রত্যাশায়। ঐ ঠেকারী মেয়েটা তা দেখেও বিন্দুমাত্র মোহিত হয়নি। এর চেয়ে ভাল ভাল দোকান, ভাল ভাল বাহাদুর-কা-খেল বোম্বাইয়ের নাকি পথেঘাটে। চালবাজ মেয়েটাকে শায়েস্তা করা যায়নি।

বিশেষ করে মনে পড়ে গেল তার 'দুয়োর ধুয়ো'। মেলাতে একজন ব্যাপারি বসেছিল এয়ার-গান নিয়ে। এক আনায় দশটা ছর্‌রা—টিপ থাকলে দশ-দশটা বেলুন ফাটিয়ে দিতে পার। পাঁচটার বেশি ফাটাতে পারলেই প্রাইজ ! রতনের মনে আছে, সে একানি দিয়ে দশটা ছর্‌রা কিনেছিল। আর ঐ রিবন-বাঁধা ঠেকারী মেয়েটা তার পাঁজর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে গুণ্‌তি করে গিয়েছিল—যতবার সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। একটা করে মিস্ করে আর পাঁচকেটা কর গুণে গুণে বলে : একে-রাম : দুয়ো ! দুইয়ে পক্ষ : দুয়ো ! তিনে নেত্র : দুয়ো !

যেবার সে লক্ষ্যভেদ করছিল—আশ্চর্য—সে-বার দেখা গেল ঐ পাঁচকে মেয়েটার দৃষ্টি অন্য দিকে, অথবা সে গা চুলকাতে ব্যস্ত।

আপাদমস্তক জ্বালা করে উঠেছিল রতনের। পাশে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে ক্রমাগত টিকটিক করে গেলে কি মাথার ঠিক থাকে ? অথবা হাতের টিপ্ ?

রাগের মাথায় কী-যেন একটা দুষ্কর্ম করে বসেছিল সে। প্রতিশোধটা কী জাতের—গাঁট্টা না চিমটি, তা আজ আর মনে নেই ; কিন্তু সেজন্য বাবার হাতে থাপ্পড় খেয়েছিল এটুকু ভুলতে পারেনি।

রতন রাজি হয়ে গেল মাকে কালীঘাট দর্শন করিয়ে আনতে।

দুয়োর-ধুয়োর শোধ তুলবে এতদিনে !

একে মাথায় খাটো : দুয়ো ! দুইয়ে রঙটা ঠিক দুধে-আলতা নয় : দুয়ো ! তিনে স্মার্টনেসের অভাব : দুয়ো !...

ট্যাক্সি থেকে কালীঘাট টেম্পল রোডের দ্বিতল বাড়ির সামনে যখন নামল বেলা তখন সাড়ে দশ। মা সকাল থেকে জলস্পর্শ করেনি। পুজো দিয়ে প্রসাদ পাবে। পারুলমাসী ওদের আদর করে বসালেন। রতনের জন্য স্রেফ এক পেয়ালা চা এল, মায়ের জন্য তাও নয়। পারুল মাসি কান্নাকাটির পর্ব শেষ করে—বৈধব্যের পরে এই ওঁদের প্রথম সাক্ষাৎ—তড়িঘড়ি তৈরী হয়ে নিলেন। দুই বান্ধবী এবার মায়ের থানে যাবেন। পুজো দিয়ে ফিরে এলে জলখাবারের পালা। মা শুধায়, তুইও যাবি তো খোকা ? রতন দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে, ওসব ভিড় ভাড়াক্কা আমার সয় না। তোমরা ঘুরে এস। আমি এখানেই বই-টই পড়ি।

ওঁরা দুজন রওনা হয়ে গেলেন। কাছেই মন্দির।

বাড়িতে যে দ্বিতীয় প্রাণী আছে এটা বোঝা যায়, অন্দরমহল থেকে ঠুন্‌ঠান্

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

শব্দ শোনা যাচ্ছে। রতন আশা করেছিল, এই সুযোগে সেই মেয়েটি একবার আলাপ করতে আসবে। এল না।

রতন খানকতক ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে বাইরের ঘরে বসেই পাতা ওল্টাতে থাকে।

ওঁরা পুজো দিয়ে ফিরে এলেন।

জলখাবারের পর্ব মিটতে বেলা বারোটা। মধ্যাহ্ন-ভোজনের যথেষ্ট দেরি। রতন বললে, কাছেই অমৃত ব্যানার্জী রোডে আমার এক বন্ধুর বাড়ি। যাই, এক চক্কর ঘুরে আসি।

মা বললে, তা যা, তবে বেশি দেরি করিস না।

তারপর ঘনিয়ে এসে অস্ফুটে বললে, ছন্দা স্কুলে গেছে। সাড়ে তিনটেয় ওর ছুটি হয়, চারটের মধ্যেই এসে যাবে।

ন্যাকামি! নাকি দর বাড়ানো হচ্ছে? অর্থাৎ—ওহে লক্ষপতি রাজপুত্র! তুমি যা ভাবছ তা ঠিক নয়। রাজবাড়ির সিংদরোজা দিয়ে বধূবেশে প্রবেশ করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমি একপায়ে খাড়া নই! কিন্তু এর আরও দুটো দিক আছে। প্রথম কথা: আজ তোর বাড়িতে দুজন অতিথি আসবে—মাকে একটু সাহায্য করতেও তো একদিন ক্যাজুয়াল-লীভ নিতে পারতিস? দ্বিতীয়ত, সারাদিন দিদিমণিগিরি করে হাপসানো শরীরটা নিয়ে যখন ফিরে আসবি তখন তোর রূপ খুলবে?

দ্বিপ্রহরে আহারাদি মন্দ হল না। রাজকীয় মধ্যাহ্ন আহারও নয়, আবার সাবড়া মাছভাতও নয়—মাঝামাঝি। তবে খাওয়া-দাওয়া মিটতে বেলা দুটো বেজে গেল। পারুলমাসি একা হাতেই সব কিছু করল। একজন বয়স্কা মহিলা—পরিচারিকা অথবা বামুনদি সাহায্য করলেন তাঁকে।

বাইরের ঘরে একটা জনকে-খাট। তার উপর ধবধবে চাদর পাতা। ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে আর ফ্যানটা খুলে দিয়ে সেই বয়স্কা মহিলাটি বিদায় নিলেন। পাতা বিছানা দেখে রতন আর ডানে-বাঁয়ে তাকায়নি। পাঞ্জাবিটা খুলে লম্বা হল। www.banglabookpdf.blogspot.com

অবেলায় খেয়েছে, অবেলায় ঘুমিয়েছে। ঘুমটা ভেঙে গেল কড়ানাড়ার শব্দে। জেগে উঠে ওর মনে পড়েনি—ও এ কোথায়! মনে হল, কড়া-নাড়ার শব্দটা সে আধোঘুমে বেশ অনেকক্ষণ ধরেই শুনেছে! তাড়াতাড়ি উঠে এসে খুলে দিল সদর দরজাটা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

অন্ধকার ঘর। দরজাটা পশ্চিম দেওয়ালে। পাল্লা দুটো খুলে দিতেই এক ঝলক পড়ন্ত রোদ এসে পড়ল ওর চোখে। চোখটা ধাঁধিয়ে গেল। তবু নজর হল—খোলা দরজার ফ্রেমে কে যেন একটা নারীমূর্তির ফুলসাইজ পোর্ট্রেট এঁকেছে। www.banglabookpdf.blogspot.com

পরণে সালোয়ার-কুর্তা, কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা-ব্যাগ। হাতে গোটানো ছাতা। বছর চব্বিশ পঁচিশ। আলোর উৎসটা ওর পিছনে। তাই মুখচোখ ভালো ঠাওর হল না। মনে হল, একটি ব্যালে-ডান্সারের সিল্যুয়েৎ! কিন্তু চিন্তাটা স্থায়ী হল না। কারণ সেই মুহূর্তেই কানে গেল যেন একটা তার সানাইয়ের ঝংকার: বাব্বা! কী কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমাচ্ছিলেন রতনদা! আমি আট দশবার কড়া নেড়েছি!

রতন নীরবে দু-হাতে চোখ কচলায়।

—নিন, সরুন। আমাকে ভিতরে ঢুকতে দিন।

রতন সসঙ্কোচে সরে দাঁড়ায়।

আশ্চর্য! মেয়েটার ব্যবহার দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, সে বিশ বছর পরে তার এই পাতানো দাদাটিকে দেখছে। যেন, সকালে সে যখন চাকরি করতে যায় তখন ঐ পাতানো দাদাটিই সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল!

রতন মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হল—তিন নম্বরী দুয়োটা তার নাগালের বাইরে—আর যাই হোক, স্মার্টনেসের অভাবের অভিযোগটা ধোপে টিকবে না।

—আবার গিয়ে শোবেন না যেন। মুখে-চোখে জল দিন। আমি চা করে আনি। মাসিমা কোথায়? উপরে?

সে তথ্যটা জানা ছিল না রতনের। বোধকরি উত্তরের আশা করে প্রশ্নটা করেনি মেয়েটি। উত্তরের অপেক্ষাও করল না। হাইহিল-জুতোয় খুটখুট আওয়াজ তুলে ভিতরে চলে গেল। হাইহিলের প্রয়োজন ছিল না যদিও। বাঙালী মেয়েদের তুলনায় সুছন্দা রীতিমতো দীর্ঘাঙ্গী।

আধঘণ্টা-খানেক পরে আবার ফিরে এল। তার হাতে চায়ের ট্রে। কীকার, দুটি শূন্যগর্ভ পেয়ালা-পিরিচ আর দুধ-চিনির পাত্র। প্লেটে বিস্কুট।

ট্রে-টা নামিয়ে রেখে বললে, জানলাগুলো ইতিমধ্যে খুলে দেননি কেন?

যেন পরের বাড়ির জানলা খোলার দায় রতনের। ছন্দা একে-একে জানলাগুলো খুলে দেয়। পড়ন্ত আলোয় ঘরটা মোহময় হয়ে ওঠে। বোধকরি মেঘে আড়াল ছিল সূর্যটা—আচমকা সিঁদুরে-লাল আলোয় ঘরের রঙটাই

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পালটে যায়।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করে, বিকালের এই বিশেষ সিঁদুরে-লাল আলোর কী যেন একটা ভারী মিষ্টি নাম আছে না? সেটা কী বলতে পারেন রতনদা?

রতন স্বীকার করল অক্ষমতা। বললে, জানি না। কী?

সুছন্দা যেন একটু রাঙিয়ে উঠল। সামলে নিয়ে বললে, আমার মনে পড়ছে না বলেই তো জিজ্ঞাসা করলাম। থাক ও-কথা। প্রথমেই অপরাধটা স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিই। আপনারা আজ আসবেন জানতাম; কিন্তু আজ আমাকে একটা উইকলি টেস্ট নিতে হল। তাই ছুটি নিতে পারিনি। অবশ্য জানা ছিল, বিকেলে দেখা হবেই।

রতন কথা ঘোরাতে বললে, আমাকে দেখেই কেমন করে চিনলে? আমার চেহারাটা মনে ছিল?

—থাকা-না-থাকা সমান। বিশ বছর পরে—বিশেষ বয়ঃসন্ধি-অতিক্রমণের জমানায় সেই সূত্র থেকে আপনাকে চিনে ফেলা সম্ভবপর নয়। চিনলাম—সার্কামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স থেকে।

রতন লক্ষ্য করে দেখে আধঘণ্টার ভিতর সুছন্দা শুধু চা-ই বানায়নি, ইতিমধ্যে স্নানটাও সেরে এসেছে। এখন ওর পরনে একটা সাদামাটা তাঁতের শাড়ি। লাল ছোপ-ছোপ 'হাজারবুটি'। গায়ে ঐ কাপড়েরই জ্যাকেট। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই—স্নানান্তে ঘাড়ে গলায় পাউডার দেওয়াটাকে বাদ দিলে। কপালে একটা বিন্দি টিপ—যেন ঐ হাজারবুটির একটাই দলছুট হয়ে ওর কপালে উঠে এসেছে। কানে দুল নেই, গলায় মঙ্গলসূত্রম। এক হাতে বালা, অপর হাতে রিস্টওয়াচ। কিন্তু সাজ-পোশাক নয় রতন মোহিত হয়ে গেল ওর প্রাণোচ্ছ্বসিত স্নিগ্ধতায়। কোন কোন সুন্দরী মেয়ের রূপের অ্যানালিটিক্যাল-বিচার করা চলে না—তার চোখ-চুল-নাক-ঠোঁট আলাদা করে নজরেই পড়ে না। ভুঁই চাপার গন্ধমেশানো এক ঝলক ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো তা বর্ণনার রাজ্য পেরিয়ে অনুভবের এলাকায়। সুছন্দার সৌন্দর্য যেন সেই জাতের।

রতন প্রশ্ন করে, সেই বারোদোলের মেলায় ঘটনাটা তোমার মনে আছে সুছন্দা?

মিষ্টি হাসল মেয়েটি। গালে টোল পড়ল এবার। বললে, অল্প-অল্প।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আপনি বন্দুক দিয়ে বেলুন ফাটাতে না পেরে শেষমেশ পিন দিয়ে আমার বেলুনটা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন বোধহয়। তাই না?

তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল সব কথা!

না, গাঁট্টা নয়, চিমটিও নয়। রতন রাগ সামলাতে না পেরে ঐ মেয়েটির হাতে-ধরা বেলুনের দাঁড়টা ছিঁড়ে দিয়েছিল। গ্যাসভরা বেলুন—তৎক্ষণাৎ তা উঠে গেল আকাশপানে। 'ভ্যাঁ'-করে কেঁদে ফেলেছিল মেয়েটা। আর তৎক্ষণাৎ যজ্ঞেশ্বরের কড়া হাতের থাপ্পড় খেয়েছিল রতন! শুধু তাই নয়, আরও মনে আছে—বাবার হাতে থাপ্পড় খেয়ে সে যখন দাঁতে-দাঁত দিয়ে চোখের জল ঠেকাচ্ছে তখন ঐ একফোঁটা মেয়েটাই তাঁর হাত চেপে ধরে বলেছিল, ওকে মের না কাকু! আমি ওকে 'এস্কিউজ' করে দিয়েছি।

বম্বের নার্সারী স্কুলের একরত্তি মেয়েটা সেই বয়সেই 'এস্কিউজ' করতে শিখে গেছিল—বোধকরি ফাদারদের কল্যাণে!

রতন জানতে চায়, মা-মাসিমা কোথায়?

—ওপরে। মায়ের শোবার ঘরে। সুখ-দুঃখের গল্প করছেন। বিশ বছরের জমানো গল্পের পাহাড় তো, সহজে শেষ হবে না।

রতন বললে, বোধহয় কথাটা তোমার ঠিক হল না সুছন্দা। সেটা অছিলা। ও'রা তোমার-আমার কথা বলার একটা সুযোগ দিতেই আড়ালে রয়েছেন।

—সেটাও সম্ভব।

—তার মানে তুমি জান, মা শুধু কালীঘাটে পুজো দিতেই আসেনি?

—ওমা, কেন জানব না? তাই তো আপনাকেও ধরে এনেছেন।

—তাহলে কাজের কথাগুলো সেরে ফেলি?

সুছন্দা একটু অবাক হয়। বলে, 'কাজের কথা' মানে?

—আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কথা। আমাদের ভবিষ্যৎ-গড়ার স্বপ্ন?

সুছন্দা জবাব দিল না। নীরবেই রইল।

মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে রতন প্রশ্ন করে: তোমার মতে, মনুষ্য-জীবনের মূল উদ্দেশ্য কী? চরম লক্ষ্য কী?

সুছন্দা হাসল। বলল, ঠিক এই প্রশ্নটাই একবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। তিনি কী বলেছিলেন জানেন?

রতন একটু বিরক্ত হল ওর এই বিদ্যেজাহির করার ভঙ্গিতে। বললে, না,

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

জানিনে। জানবার কৌতূহল নেই। আমি তোমার মতামতটা জানতে চাইছি : জীবনের মূল লক্ষ্যটা কী ?

সুছন্দা তার হরিণের মতো আয়ত দুটি চোখ তুলে বললে, ঐ প্রশ্নটার উত্তর খোঁজা।

—মানে ?

—জীবনের চরম লক্ষ্য : খুঁজে বার করা—জীবনের চরম লক্ষ্যটা কী ?

রতন গুম খেয়ে যায়। এসব প্যাঁচালো-কথা তার ভাল লাগে না। বলে, শুনেছি তুমি বি. এ. পাশ। ফিলজফিতে অনার্স ছিল বোধহয়, তাই নয় ?

—হ্যাঁ তাই। আপনার কিসে অনার্স ছিল ?

রতনের কান দুটি লাল হয়ে ওঠে। বলে, আমার বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে—

—ও হ্যাঁ। শুনেছি সে-কথা !

রতন প্রশ্ন করে, তুমি অনার্স নিয়ে পাশ করলে, এম. এ. পড়লে না কেন ?

—অর্থনৈতিক কারণে। বাবা মারা গেলেন। বাধ্য হয়ে একটা চাকরি নিতে হল।

—অর্থনৈতিক বাধাটা অপসারিত হলে এখন এম. এ. পড়ার ইচ্ছে আছে ?

সুছন্দা একটু চুপ করে রইল। কী-যেন ভাবছে সে। অবশেষে বললে, ডিপেণ্ডস্ ! পড়াশুনার কথা থাক বরং।

—বেশ থাক। আমি স্মোক করি, এতে আপত্তি নেই তো তোমার ?

—ওমা, আমার আপত্তি হতে যাবে কোন দুঃখে ? মা বা মাসিমা এখন নিচে আসবেন না। আপনি ইচ্ছে করলে সিগারেট ধরাতে পারেন।

—আমি সে-কথা বলছি না। আই মীন—স্মোকারদের তুমি 'টলারেট' কর তো ? আমি কিন্তু ড্রিংক্সও করে থাকি। তবে মাতাল হই না।

সুছন্দা বললে, 'যে মদ খায় অথচ বলে জীবনে কখনো মাতাল হয়নি, হয় সে মিথ্যে কথা বলে, অথবা মদের বদলে জল খায়।'

রতনের কান দুটো আবার লাল হয়ে ওঠে। দৃঢ়স্বরে কৈফিয়ৎ চায়, কে বললে ?

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় !

রতনের মনে হল : দুয়োর তালিকাটা ক্রমশ অন্য ধাঁচের হতে চলেছে ! মোট কথা এ মেয়েকে নিয়ে তার পোষাবে না। কথায়-কথায় বিদ্যে জাহির

www.banglabookpdf.blogspot.com

করা ওর একটা ম্যানিয়া !

সুছন্দা বলে, আপনি তো দু-দুটি কনফেশান শোনালেন, 'এনি আদার ভাইস' ?

—তার মানে ?

—বাঙালীর ছেলে—মাছ-মাংস খাবেনই। যুদ্ধের কল্যাণে 'মুদ্রার মৈনাক' বানিয়েছেন, সেকথা মায়ের কাছে শুনেছি। মদ্যও পান করে থাকেন। তাই জানতে চাইছি আর কি—এনি আদার 'ম'-কারান্ত ভাইস ?

প্রতি-আক্রমণই আত্মরক্ষার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। রতন তাই বলে বসে, ঐ কথাটা আমিই জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। আমরা আসছি জেনেও তুমি যখন একটা দিন ছুটি নিতে পারলে না, তখন সেই প্রশ্নটাই জেগেছিল আমার মনে—তোমার কোনও বোম্বাই-মার্কা বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে আবার ইয়ে-টিয়ে নেই তো ? সে-আমলে তোমার তো বোম্বাইয়ের সবকিছুই ভাল লাগতো ?

সুছন্দা হেসে ওঠে। বলে, আপনি রাগ করছেন ! নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমি ফ্র্যাংক অ্যাণ্ড ক্যাণ্ডিড। সেরকম কিছু থাকলে আমি প্রথমেই বলতাম : থ্যাংকস্ ফর দ্য প্রপোজাল, বাট আয়াম টায়েড আপ এলসহোয়্যার !

রতন জানতে চায়, স্মোকিং আর ড্রিংকিং-এ তোমার অ্যালার্জি নেই বললে, তাহলে তোমার অপছন্দের জিনিস কী ? কাদের সইতে পার না ?

—স্নবস্ অ্যাণ্ড বোরস্ !

বড় বেশি ইংরেজি বুকনি। তবে সেটা অস্বাভাবিক নয়। বরাবর কনভেন্টে পড়ার ফল !

রতন বললে, এবার একটা শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি : গ্রেটা গার্বো, মার্লিন ড্রিয়াট্রিচ, নর্মা শিয়ারার আর এলিজাবেথ টেইলার—এই চারজনের মধ্যে তোমার মতে কে বেশি সুন্দরী ?

কোথাও কিছু নেই, খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মেয়েটি। রতন একটু অপ্রস্তুত বোধ করে। বলে, এতে হাসির কী হল ?

—আপনি দারুণ ইন্টারভ্যু নিচ্ছেন কিন্তু রতনদা !

—ঠিক আছে, ইংরেজি ফিল্ম দেখার নেশা যদি না থাকে তবে থাক, ও প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না তোমাকে।

—তা কেন ? জবাব নিশ্চয়ই দেব। তাই বলব—আপনার প্রশ্নটা অবৈধ। আপনি 'অ্যাংগেল অব ভিশান' ব্যাপারটা খেয়াল করেননি। ইংরেজি ফিল্ম

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আমি দেখি, যথেষ্টই দেখি! তবে আপনার প্রশ্নটা নিয়ে কখনো ভাবিনি। আমি মনে মনে শুধু ভাবি—ওদের মধ্যে কে সবচেয়ে সুন্দর : ডগলাস ফেয়ার-ব্যাঙ্কস, এরল ফ্লিন, গ্রেগরী পেগ, না স্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার!

রতন হেসে ফেলে। বলে, কুইটস্! বেশ, তাই না হয় বল। বিলিতি ফিল্মের কোন নায়ককে তোমার সবচেয়ে পছন্দ?

—পছন্দ? প্রশ্নটা কিন্তু বদলে গেছে এবার! আমার সবচেয়ে যাকে পছন্দ তিনি ঐ চারজনের একজনও নন—চার্লি চ্যাপলিন।

রতন তখন 'হ্যাঁ-না'-র দোলায় দুলছে। বিদ্যে জাহির করাটা বদভ্যাস বটে, কিন্তু মেয়েটা গুড 'টেবল্-টকার'! শুধু সুন্দরী নয়, ওর কথাবার্তার মধ্যেও চমক আছে, গ্ল্যামার আছে। বললে, তুমি একটু আগে বলেছ, আমিই ইন্টারভ্যু নিচ্ছি। ব্যাপারটা তা কিন্তু নয়। তুমিও ইচ্ছে করলে আমার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পার। এনি কোশ্চেন?

মেয়েটি বললে, বেশ বলুন—জসীমুদ্দীন আর জীবনানন্দ—এঁদের মধ্যে কার রচনায় আপনার মতে গ্রাম-বাঙলার ছবি সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে।

এর চেয়ে দর্শনের ছাত্রীটি যদি কান্ট-হেগেল বা শফেন-হাওয়ারের বিষয়ে কোন প্রশ্ন পেশ করত তাহলে অজ্ঞতা স্বীকার করাটা সহজ হত। রতন বললে, জসীমুদ্দীনের কোনও উপন্যাস আমি পড়িনি, জীবনানন্দের কী-একটা নভেল পড়েছিলাম—ভাল মনে নেই···

অবাক দুটি চোখ মেলে স্থাণুর মতো বসেই রইল মেয়েটা। রতন অপ্রস্তুত হয়ে বলে, বাঙলা বই-টই আমি বিশেষ পড়ি না।

সুছন্দা কথা ঘোরায়। জানতে চায়, আর একটু চা দিই?

—দেবে? দাও!

সেদিন রাত্রের ট্রেনে ওদের ফেরা হয়নি। পরদিন সকালে বিদায় নেবার আগে সংক্ষিপ্ত সময় পেয়েছিল জনান্তিক সাক্ষাতের। সারারাত ভেবে মনস্থির করেছিল রতন। আড়ালে পেয়ে বলেছিল, তোমাকে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি ছন্দা। কাজটা শক্ত। পারবে তো?

—কী কাজের দায়িত্ব? আগে শুনি।

—আমরা চলে যাবার পর মাসিমাকে বল : 'রতনদা রাজি'! পারবে তো?

চোখে চোখে তাকালো না তবুও। নীরবে নতনয়নে কী যেন ভাবছে।

—কী হল? কী বললাম বুঝতে পারলে না?

www.banglabookpdf.blogspot.com

—কেন পারব না? এ তো সহজ কথা!

—মাসিমাকে কী বলবে বল তো?

—'বার্কিস্ ইজ উইলিং'!

—মানে?

—এতক্ষণে চোখে-চোখে তাকালো। একগাল হাসল। আবার টোল পড়ল গালে। বললে, শুধু বাঙলা বই নয়, রতনদা—আপনি ইংরেজি বই-টইও নেড়ে দেখার সময় পাননি! ওটা 'ডেভিড কপারফিল্ড' থেকে।

বইটা পড়েনি, তবে সিনেমাটা দেখা ছিল। মনে পড়ল না। ঠিক সেই সময়েই এসে হাজির হলেন মা, নে চল এবার! না হলে ট্রেনটা ধরতে পারব না!

রোখ চেপে গিয়েছিল ওর।

মাসখানেকের ভিতরেও কালীঘাট পোস্ট-অফিসের ছাপ মারা কোন চিঠি না আসায়। মা ফিরে এসে নিরাপদ পেঁছানো সংবাদ দিয়েছিল। ব্যাস! তারপর ও-পক্ষ নিশ্চুপ। মাসিমা জানতে চাইলেন না—মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি না। তার একটাই অর্থ : মেয়েটা তার মাকে কিছু বলেনি। ইতিমধ্যে একখণ্ড 'ডেভিড কপারফিল্ড' কিনে পড়ে ফেলেছে। সবটা নয়—ঐ উদ্ধৃতিটা পর্যন্ত : 'বার্কিস ইজ উইলিং'!

কী ভেবেছে মেয়েটা? সে ঐ 'বার্কিস'-এর মতো একটা হাড়-হাবাতে-হ্যাংলা? ইস্কুলের মাস্টারনি—কত টাকাই বা মাইনে পাস যে, দূরে দাঁড়িয়ে দুয়োর-ধুয়ো দিয়ে যাচ্ছিস?

একদিন নিজে থেকেই মাকে জিজ্ঞাসা করল, কই তুমি তো জানতে চাইলে না, সুছন্দাকে আমার পছন্দ হয়েছে কি না?

মা অভিমান করে বলেছিলেন, সে-কথা তোকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবার সুযোগ তুই দিলি কোথায়? আচ্ছা তোর একটু মায়াও হল না? মেয়েটাকে মুখের উপর বলে এলি—তোর পছন্দ হয়নি?

রতন স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, কে বললে?

—কে আবার বলবে? তোর মাসিমাই চিঠিতে লিখেছে! ছন্দা তার মাকে বলেছে—তুই নাকি ওকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে এসেছিস্! আশ্চর্য! একটা কুমারী মেয়েকে মুখের উপর ও-কথা বলতে হয়? থাক বাবা! আমি আর ওর

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভিতর নেই ! আমার ঘাট হয়েছে !

রতন গভীরভাবে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। এমন অদ্ভুত আচরণের অর্থ কী হতে পারে ? তিন-তিনটি সম্ভাবনার কথা মনে হল তার। তিনটি হেতুতে এ জাতীয় মিথ্যার আশ্রয় ও নিতে পারে। এক : তার একজন গোপন প্রেমিক আছে। দুই : সে রতনকে নিয়ে খেলা করছে—বোকা বানাতে চাইছে। তিন : রতনকে সে নিজেই পছন্দ করেনি।

প্রথম সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়া যায় না। ছন্দা বলেছিল—তেমন কোন প্রেমিক থাকলে সে জনান্তিকে বলত : থ্যাংকস ফর দ্য প্রপোজাল, কিন্তু আমার টিকি অন্যত্র বাঁধা আছে। সেটা সহজ ও সত্য কথা। সে-কথা বলার হিম্মৎ ওর আছে। তৃতীয় সম্ভাবনাটাকেও মেনে নেওয়া ওর ধাতে নেই—রতন সুন্দর, সুদর্শন, অগাধ সম্পত্তির মালিক—কুমারী মেয়ের কল্পলোকের রাজপুত্র সে। সুতরাং দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই একমাত্র সমাধান। ও নিছক দুষ্টুমি করতেই এই চালটা চেলে দেখছে—ও-পক্ষ কী চাল দেয় !

রতন মায়ের কাছে এসে বলল, না মা, তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি, আর দেব না। তোমার পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে করব, তবে একটা শর্ত আছে !

মা আকাশ থেকে পড়লেন, শর্ত ! কী শর্ত বাবা ?

মাসিমা শুধু শাখা-সিঁদুর দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করবেন। তোমার গৃহবধূকে সাজিয়ে আনবে তুমি। খরচপাতি সব আমার !

মা বজ্রাহত হয়ে গেছিল !

ফুলশয্যার রাত্রে রতন জিজ্ঞাসা করেছিল তার নববধূকে, মাসিমাকে অমন বেমক্কা মিছে কথাটা বলেছিলে কেন ?

সুছন্দা হেসেছিল। এবার কিন্তু তার গালে টোল পড়েনি। বলেছিল, 'নারী রহস্যময়ী' জান না ?

—কিন্তু এ রকম মারাত্মক রহস্য ? 'হাঁ' কে 'না' ?

ভাগ্যকে মেনে নেবার চেষ্টা করেছিল সুছন্দা। নিয়ে ছিলও।

'তোমার মাপে হয়নি সবাই, তুমিও হওনি সবার মাপে'। পঞ্চাশের দশকে একটি পিতৃহীন অনূঢ়াকন্যা তার বিধবা মাকে নিষ্কৃতি না দিয়ে পারেনি। রতন কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি—সুছন্দা ওকে আদৌ পছন্দ করেনি। ঐ যে কথাটা সে বলেছিল সেদিন—সে সইতে পারে না দু জাতির অসৈরণ—'স্নবস্

www.banglabookpdf.blogspot.com

অ্যাণ্ড বোরস্'—সেটা ওর অন্তরের কথা। নিবারণ ঘোষ মশাই ছিলেন বোম্বাইয়ের একজন নামকরা অ্যাডভোকেট—'নামকরা' বলতে আর্থিক অর্থে নয়, প্রবাসী বাঙালী মহলে সুপরিচিত। তাঁর ছিল নানান সখ। আর সুছন্দা ছিল বাপের ভা—রী আদরের। মেয়েকে শুধু যত্ন করে লেখাপড়া আর গানই শেখাননি—একটি সত্যিকারের রুচিশীলা প্রবাসী বঙ্গললনা করে গড়ে তুলেছিলেন। তাই সেই কনভেন্ট-লালিতা মহারাষ্ট্রে-মানুষ মেয়েটির মনে ঐ আজব প্রশ্ন : 'গ্রাম-বাঙলার ছবি কার কলমে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে'—জীবনানন্দ না জসীমউদ্দীন !' ঘোষ-মশায়ের উপার্জনের একটি বৃহৎ-অংশ দখল করত তাঁর লাইব্রেরী ঘরখানা। বই, বই আর বই। আর সুছন্দা ছিল তারই পোকা। তার মানসিক বিচরণ ক্ষেত্র এমন একটি জগতে যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণাই নেই ধনকুবের রত্নাকরের।

কলেজ-জীবনে ঐ সুন্দরী মেয়েটির প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিল অনেক যুবক। তাদের অনেকেই সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, ধনীর দুলাল—বয়সের ধর্মে সুছন্দার অন্তরেও সঞ্চারিত হয়েছিল বিপরীত-মেরুর চৌম্বকবৃত্তি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মোহভঙ্গ হয়ে যেত। দেখা যেত, পাণিপ্রার্থীরা হয় 'স্নব' নয় 'বোর'। তারা জানে না—আলাদীনের সেই দৈত্যটার নাগালের বাইরে আছে একটি সম্পদ : পরিশীলিত রুচি, যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। আর রসিকতা করলে যারা তার অর্থ বোঝে না—সময়ে হাসতে জানে না—তাদের কিছুতেই সইতে পারে না সুছন্দা। কবির মতো তারও প্রার্থনা ছিল—হে চতুরানন, আমার ললাটে শত শত ইতরতাপ লিখে যেও, সব সইবে আমার, শুধু দেখ, যেন অরসিককে রস নিবেদনের বিড়ম্বনা আমাকে সহ্য করতে না হয় !

বেচারি ! সেই দুর্দৈবই দেখা দিল ওর কপালে। ওরা দুজন ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা।

নতুন সংসারে সে সব কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিল। ঘর দোর নতুন করে সাজায়, সব কিছু ছিমছাম রাখে। শাশুড়ীর সেবাযত্নের ত্রুটি নেই। এমন কি রতনের পান থেকে চুন খসে না।

কলেজে ভর্তি হতে রাজি হল না। এম. এ. পড়বে না। বরং গান ধরল। অবসর সময়ে তানপুরা নিয়ে ক্লাসিকাল গান করে। রতন একজন ওস্তাদের ব্যবস্থা করে দিল। এল তবলচি। সুছন্দা একখানা ঘরকে 'লাইব্রেরীরুম' করল। যেন 'নস্ট্যালজিয়ায়' ডুবে থাকতে চায়। আলমারি কিনে সাজালো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

রতনের তাতে ভারি উৎসাহ। ক্লেট ভর্তি বই আসত মাসে-মাসে। সুছন্দা সেগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত। দিবারাত্র বই পড়ত। বিশেষ, রতন যখন ট্যুরে যেত। তাকে মাঝে-মাঝেই দু-তিন সপ্তাহের জন্য ট্যুরে যেতে হত— প্রমোদ ভ্রমণ। ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবস্থাপনায়। য়ুরোপ আমেরিকা পর্যন্ত। ফরেন ট্যুর বছরে একবার। মা বলতেন, তুমিও একবার ঘুরে এস না বৌমা?

সুছন্দা রাজি হত না। শাশুড়ীকে ফেলে যেতে। উনি তো ও'র আচার-বিচার নিয়ে যেতে পারবেন না। রতনও কখনো পীড়াপীড়ি করেনি এ নিয়ে। তৃতীয় বছরে ওর কোলে এল সন্তান। এখন আবার অন্য জাতের সমস্যা। খোকন একটু বড় হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কেমন করে যাবে?

দুর্ঘটনাটা ঘটল যখন ঋদ্ধির বয়স আড়াই বছর!

তারিখটা মনে আছে: সতেরই ফাল্গুন! সেটাই ওদের বিবাহ-বার্ষিকী!

ওর পঞ্চম বিবাহ-বার্ষিকীর চিহ্নিত দিনে অ্যাটম-বোমাটা ফাটল!

তার দিন পনের আগে ছাব্বিশ দিনের লম্বা ট্যুর সেরে রতন ফিরে এসেছে। এবার ইউরোপের ট্যুরে যথেষ্ট লাভ হয়েছে। ইটালী-ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড-জার্মানী-ডেনমার্ক আর লন্ডন। কিছুটা প্লেনে, কিছুটা লাক্সারী বাসে। সুছন্দা এই তিন-চার সপ্তাহ ধরে প্রতিটি রাজ্য থেকেই পিকচার পোস্টকার্ড পেয়েছে। মাঝে মাঝে মুখবন্ধ খামে বানানভুলে-ভরা মেলড্রামাটিক ভাষায় প্রেমপত্র। ফিরে এল প্রচুর উপহার সামগ্রী নিয়ে—ইলেকট্রনিক গ্যাজেট, ক্যামেরা, কসমেটিক—সবই সুছন্দার জন্য। ঋদ্ধির জন্যে দম দেওয়া আজব পুতুল, মায়ের জন্য পিতলের বুদ্ধমূর্তি।

বিবাহ-বার্ষিকীর দিনটা খেয়াল ছিল। কায়দা করে তার দিন পনের আগেই ফিরেছে। বিদেশ থেকে যা কিছু উপহার এনেছে তা আগেই উপহার দেওয়া হয়ে গেছে। তাই রত্নেশ্বর গিয়েছিল কলকাতায়—একটা জরোয়া নেকলেস কিনে আনতে। প্রতি বছর সে কিছু না কিছু উপহার দেয় স্ত্রীকে।

সতের তারিখ সকালে সে ফিরে এল কলকাতা থেকে। কিন্তু নেকলেসের প্যাকেটটা হাতে করে সুছন্দাকে দেওয়া হল না। ভেবেছিল, নৈশাহার সেরে শুতে এসে রুদ্ধদ্বার কক্ষে মালাটা ওর গলায় পরিয়ে দেবে। হল না।

সুছন্দা শুতে এল না। নজর হল—বিছানায় রাখা আছে সুদৃশ্য কাগজে মোড়া লাল ফিতে জড়ানো একটা প্যাকেট।

কী ওটা? এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com সাইট থেকে ডাউনলোডকৃত।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বুঝল—এটা সুছন্দাই রেখে গেছে। কিন্তু ওর জন্যে বিবাহবার্ষিকীর উপহারই যদি হবে তাহলে নিজে হাতে না দেবার অর্থ কী?

প্যাকেটটা খুলে ফেলল রত্নেশ্বর।

সেটাই ঐ অ্যাটম-বোমা!

একখানি চিঠি। লিখছে মৈত্রেয়ী নামের একটি মেয়ে, সুছন্দাকে। রতন চিনতে পারল না প্রথমটা—একটু পড়েই বুঝতে পারে।

মৈত্রেয়ী সুছন্দার সহপাঠিণী। সে আর তার স্বামী গিয়েছিল সম্প্রতি ইয়োরোপ ভ্রমণে। 'ভেনাস ট্রাভলস্'-এ। মেয়েটি কিন্তু ঐ এক মাসের মধ্যে ঘুণাক্ষরেও জানায়নি যে, সে সুছন্দার বান্ধবী। বোম্বাইয়ে ওরা এক কলেজে পড়েছে। ওদের বিবাহে তার নিমন্ত্রণ ছিল, আসতে পারেনি। এমন কি তার অনুরোধে সুছন্দা ওদের যুগল-ফটোও উপহার পাঠিয়েছে। কথা-প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী লিখেছে, "মীনাকে মিসেস দত্ত বলে পরিচয় করিয়ে দেবার পরেও আমি বুঝতে পারিনি—ব্যাপারটা আসলে কী! হোটেলে ওরা ডবল্-বেডেড রুমে শুতে যেত—স্ত্রী তো বটেই। কিন্তু তোদের যে ডিভোর্স হয়ে গেছে তা তো জানি না। ভেবেছিলুম সরাসরি তোর এক্স-হাসবেন্ডকে জিজ্ঞাসা করব; কিন্তু অনিল বারণ করল। বললে, কী দরকার তোমার? হয়তো এই রত্নেশ্বর দত্ত আর তোমার বান্ধবীর স্বামী এক লোক নন! ফিরে এসে কালীঘাটে তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করে মনে হল—তোকে সব কথা জানানো উচিত। মাসিমা বললেন, তোদের বিবাহ-বিচ্ছেদ আদৌ হয়নি, আর তোর স্বামীই 'ভেনাস-ট্রাভল্স্'-এর মালিক। মাসিমাকে আমি কিছু জানাইনি। তবে তোর কাছ থেকে গোপন করাটা উচিত হবে না বলে সবকিছু জানিয়ে এই চিঠি দিলাম। জানি, তুই আমাকে অভিসম্পাদ দিবি। কিন্তু রাগ পড়ে গেলে নিশ্চয় বুঝবি—আমি যা করছি তা তোর ভালর জন্যই। তুই কী করবি সেটা তোর বিবেচ্য। এই সঙ্গে খান কয় ফটো পাঠালুম। যাতে মীনা মেয়েটাকে চিনতে পারিস।"

রতনের চোখ দুটো জ্বালা করে উঠেছিল। তার বিচিত্র চিন্তাধারায় দুঃখ বা রাগের চেয়ে বিস্ময়ের অনুভূতিটাই প্রাধান্য পেল। সেই হারামজাদী—মৈত্রেয়ী, এমন জব্বর সুযোগটা নিল না কেন? ওরা স্বামীস্ত্রীতে তো বুঝতে পেরেছিল, মীনা ওর বৈধ স্ত্রী নয়। এটাকে মূলধন করে ওরা যুগলে তো দোহন শুরু করে দিতে পারত রতনকে। সহজ উপার্জন: ব্ল্যাকমেলিং! সেটা না করে এমন একখানা পত্রাঘাতে একটা সুখী সংসারের মৌচাকে বেমক্কা খোঁচা মেরে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পালিয়ে যাবার অর্থ কী ? এক ফোঁটা মধুও তো পেলি না তোরা !

খামের ভিতর থেকে বার করে দেখল সেই রঙীন ফটোটা—'ল্যভার্স' কর্ণারে' ওদের যুগল ছবিটা। রত্নেশ্বরের বাহুবন্ধে ধরা দিয়ে মীনা পারেখ নির্লজ্জের মতো হাসছে !

ক্র্যাকাটোয়ায় অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল 1883 খ্রীষ্টাব্দে। দশ-বিশ লক্ষ হাইড্রোজেন-বোমার সমতুল্য সে বিস্ফোরণ ! জীবনের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রইল না সেখানে। মনে হয়েছিল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বুঝি হারিয়ে গেল সেই দ্বীপটা ! প্রায় সাতাশ বছর ধরে সে দ্বীপে প্রাণের কোন চিহ্ন খুঁজে পাননি বিজ্ঞানীরা। জীবজন্তু পশুপাখি তো নয়ই, এমনকি পোকা-মাকড়, শ্যাওলা উদ্ভিদও নয়। কিন্তু ধরিত্রী মাতার সেই ক্ষণিক বিস্ফোরণ চিরকালের জন্য ক্র্যাকাটোয়াকে জীবন-বিমুখ করে রাখতে পারেনি। দ্বীপান্তর থেকে একদিন ভেসে এসেছিল প্রাণের স্পন্দন ! তিল তিল করে ঠাঁই করে নিয়েছিল শ্যাওলা, লাইকেন্স, কাঁটাগুলো। এল পাখিরা, সরীসৃপেরা, ক্রমে স্তন্যপায়ীরা। কেউ তাদের হাত ধরে নিয়ে আসেনি। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের প্রেরণাতেই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ক্র্যাকাটোয়া দ্বীপ আবার বনসম্পদে আকীর্ণ হয়ে গেল—সবুজে-সবুজ, লালে-লাল। পাখির কূজনে কলমুখরিত হয়ে উঠল মৃত দ্বীপ !

হিরোসিমা-নাগাসাকির ইতিহাসও তাই !

রতন অপেক্ষা করে আছে তাই।

সূর্যপ্রদক্ষিণ-ছন্দের চক্রাবর্তনে ইতিমধ্যে পৃথিবী সতেরবার নিয়ে এসেছে সতেরটি সতেরই ফাল্গুন। ক্র্যাকাটোয়া-দ্বীপে দেখা দেয়নি সবুজাভা অথবা শোনা যায়নি পাখির কলকূজন।

প্রথম রাত্রে রতন সাহস করে খোঁজ করেনি—কোথায় রাত্রিযাপন করল সুছন্দা। পরে টের পেল ঠিক পাশের ঘরেই ছেলেকে নিয়ে সে শোয়।

রতন বুঝতে পারে—তাড়াহুড়া করাটা কোন কাজের কথা নয়। 'টাইম ইজ দ্য বেস্ট হীলার'। পতিব্রতা নারী যদি হঠাৎ টের পায় যে, তার স্বামী পরদারগমনের প্যাঁচে জড়িয়ে পড়েছে তখন সাময়িকভাবে সে ক্ষেপে যায়। কীলটা চড়টা মেরে বসতে পারে, আঁচড়ে-কামড়ে দেওয়াও অসম্ভব নয়। সেসব কর্তাকে সইতে হয়। মজা লোটার মাশুল ! কিন্তু এ কী রে বাবা ! এ তো মুখে রা-কাটে না ! খিস্তি-খেউড়টাও করে না। যা হোক দু-ঘা দিয়ে ঝাল

ঝাড়। না হয়, কর্তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আর কারও সঙ্গে ফ্লার্ট কর ! সে সব কিছুই করল না মেয়েটা। বস্তুত আপাতদৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন কারও নজরে পড়ল না। যথানিয়মে দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যায় সুছন্দা—নিরলস নিষ্ঠায়। যথারীতি অবকাশ যাপন করে তানপুরাটা টেনে নিয়ে, অথবা লাইব্রেরী ঘরে।

এই সতের বছরে নানানভাবে চেষ্টা করে দেখেছে রতন, কিন্তু সংকল্প থেকে ওকে টলাতে পারেনি।

একবার বলেছিল, খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হলেও লোকের আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা অধিকার থাকে। তুমি কি আমার বক্তব্যটা শুনবে না ? আমার কৈফিয়ৎ দাবী করবে না ?

ছন্দা ওর চোখে-চোখে চাইল। বলল, তোমার-আমার সম্পর্কটা সওয়াল-জবাবের নয়। কৈফিয়ৎ আমি দাবী করব কেন ? আমি তো বাক্যালাপ বন্ধ করিনি। তোমার কিছু বলার থাকলে, বলো ?

—মীনার ব্যাপারটা আমি খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই, শোন—

—না। মীনার সম্বন্ধে আমার তো কোন কৌতূহল নেই। জানার বাকিও নেই কিছু। যেটা জানি না, সেটাই জানতে চাইব ভেবেছিলুম, তারপর মনে হল—কী লাভ ?

—কী ? কোন কথাটা জানতে চেয়েছিলে তুমি ?

—ভেবেছিলাম সুযোগ মতো জেনে নেব, কেন তুমি সেদিন আমাকে জ্ঞাতসারে মিছে কথা বলেছিলে ?

—কবে ? কবে আমি মিছে কথা বলেছি ?

—একেবারে প্রথমদিন। বিয়ের আগে। সেই যেদিন আমি জানতে চেয়েছিলাম—'এনি আদার ম-কারান্ত ভাইস ?' সেদিন কেন সত্য গোপন করেছিলে ? মোহ, ভয় না কাম ?

রতন এ-কথার জবাব খুঁজে পায়নি।

জনান্তিক কথাবার্তা ক্রমেই কমে এল। যেটুকু না বললে নয়—তাও সাংসারিক প্রয়োজনে। সুখ-দুঃখের আন্তরিক আলাপচারি ক্রমশই বন্ধ হয়ে গেল। রতন এ নিয়েও অভিযোগ করেছে, তুমি দিবারাত্র মনে মনে গুমরাচ্ছ ছন্দা। কী ভাব এত ?

সুছন্দা ম্লান হেসে বলেছিল, ভাবি না তো। মনে মনে একটা মন্ত্র জপ করে যাই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, এই মন্ত্রটাতে কুমু যেমন সান্ত্বনা

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পেয়েছিল, আমি তা পাই না। একেই বোধহয় বলে 'জেনারেশান গ্যাপ'! কুমুদিনীর কাল হারিয়ে গেছে!

—কে কুমুদিনী? কী মন্ত্র মনে মনে জপ করত সে? অথবা তুমি?

এবার রতনের চোখে চোখ রেখে ও বলেছিল 'পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ/ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াইর্হসি দেব সোঢ়ুম।'

রতন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ঢোক গিলে বলে, তার মানে?

—মানেটা আমি নিজেই ধরতে পারছি না, তোমাকে কী বোঝাবো?

শেষমেশ মরিয়া হয়ে রতন দাখিল করেছিল তার আখেরি-প্রস্তাব: শোন ছন্দা! এভাবে চলতে পারে না। হ্যাঁ, অপরাধ স্বীকার করছি। আমার উচিত ছিল তোমাকে সব কথা খুলে বলা। অন্তত আমাদের বিয়ের পর মীনার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া। তা আমি দিইনি। সেজন্য শাস্তিও তুমি বড় কম দাওনি আমাকে। কিন্তু আবার কি নতুন করে সবকিছু শুরু করা যায় না?

—কী বলতে চাইছ তুমি?

—'ভেনাস-ট্রাভলস্' এখন ফুলে ফেঁপে বিরাট হয়ে গেছে। দুর্দান্ত লাভের ব্যবসা। তা হোক—সেটা আমার জীবনের সুখশান্তির চেয়ে বড় নয়। ধর, আমি যদি আমার সব শেয়ার জলের দরে বেচে দিই? মীনা পারেখের সঙ্গে সব সম্পর্ক মুছে ফেলি? তাহলে কি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার না? আবার কি আমরা সেই হারানো দিনগুলিকে ফিরে পেতে পারি না?

ছন্দা এককথায় জবাব দিতে পারেনি। নতনয়নে সে যেন গভীরভাবে কী ভাবছে।

রতন যোগ করে, তোমার অসীম করুণা যে, কথাটা এখনো পাঁচকান হয়নি। অন্তত মায়ের কানে ওঠেনি। আর ধন্যবাদ তোমার সেই বান্ধবীকে—মৈত্রেয়ী, না কী যেন নাম—তিনিও মুখরোচক কেচ্ছাটা গাবিয়ে বেড়াননি। কিন্তু ভেবে দেখ ছন্দা, ছেলেটা বড় হয়ে উঠছে। জীব-বিজ্ঞান পড়তে শুরু করেছে! বাবা-মা কেন একঘরে শোয় না—এ প্রশ্নটা আর দু-চারদিনের ভিতরেই তার মনে জাগবে। সেটা কি ভাল? বল, আমি যদি মীনাকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করে তোমার কাছে ফিরে আসতে পারি, তাহলে তুমিও কি পার না তোমার সেই হারানো দিনগুলোয় ফিরে যেতে?

সুছন্দা নতনেত্রে বলে, ডিপেন্ডস্! আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—না! তোমাকে কথা দিতে হবে।

—তা কী করে দেব? মনের উপর মানুষের কি জোর খাটে?

—খাটে! চেষ্টা করলে কী না হয়?

—চেষ্টা করলে সবসময় সবকিছু হয় না! দেখলেই তো! ঐ যে আমার তানপুরাটা। হাত থেকে পড়ে ফেটে গেল। কত টাকাই তো খরচ করলে তুমি। কিন্তু সেই আগেকার সুর তো ওতে বাজে না!

—তার মানে তুমি কথা দেবে না?

—কী করে দেব? তুমি যে আমার মুঠোয় ধরা বেলুনটার দড়ি ছিঁড়ে দিলে। স্বপ্নভরা বেলুনটা আমার চোখের সামনেই উঠে গেল আকাশে!

—ওসব কাব্যকথা ছাড়। যা বলতে চাও, সোজা কথায় বল।

—যা আমার নাগালের বাইরে সে-বিষয়ে কী করে কথা দেব আমি? এটুকুই শুধু বলতে পারি যে, আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না!

রতন এ ফাঁকা বুলিতে আস্থা রাখতে পারেনি। এ কয়বছর সে 'ভেনাস ট্রাভলস্'-এর ট্রিপ নিয়ে বিদেশযাত্রা করেনি। এবার সেই আয়োজনই করতে বসল। ও দেখতে চায়—মেয়েটা ভয় পেয়ে এবার মেনে নেয় কি না।

নিল না। খবর পেয়ে জনান্তিকে শুধু বললে, এবার আর ঐ ভুলটা কর না। পাশাপাশি দু'খানা সিঙ্গল বেডের রুম ভাড়া নিও হোটেলে। কেমন?

রতন দাঁতে-দাঁত চেপে বলেছিল, থ্যাংক্স্ ফর দ্য সাজেস্শান!

ঋদ্ধি দুর্দান্ত রেজাল্ট করল হায়ার সেকেন্ডারিতে। তিন-তিনটে লেটার—ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ। যতীন সোম তার উপর দিয়ে—থার্ড র‍্যাংক পেল এই মফঃস্বলের কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রটি। কিন্তু কী পাগলামি! ঋদ্ধি কিছুতেই রাজী হল না কলকাতার হস্টেলে গিয়ে পড়তে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অ্যাডমিশন-ফর্ম নিয়ে এসেছিল রত্নেশ্বর; সেটা ও ফিল-আপই করল না। বাপ জানতে চাইল, কেন যেতে চাও না কলকাতায়?

ছেলে বললে, যতীনও তো যাচ্ছে না?

কোন মানে হয়? সারাজীবন ঐ যতীনের কাছা চেপে ধরে চলতে চায় নাকি ছেলেটা? যতীন মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছাত্র—ওর বাপ 'অ্যাফোর্ড' করতে পারে না বলেই এই মফঃস্বল কলেজে ঢুকেছে। যতীন একা নয়, ওর আরও সব বন্ধু—কল্যাণ, সুখময়, দিব্যেন্দু। এই সহজ কথাটা ঢুকছে না ঐ স্কলারশিপ পাওয়া ছেলেটার নিরেট মাথায়? নতনেত্রেই এক নাগাড়ে প্রতিবাদ

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

করে গেল, তা কেন ? যতীন তো জেনারেল স্কলার ! তার পড়াশুনা করতে টাকা লাগবে কেন ?

—তাহলে এই মফঃস্বলের গোয়ালে পড়ে থাকছে কেন সে ?

—সে তুমি বুঝবে না !

এই আর এক 'বোল' ; তুমি বুঝবে না, তোমরা বুঝবে না—তোমরা সবাই ওল্ড স্কুলের—'জেনারেশন গ্যাপ' !

তার চেয়েও দুঃখের কথা, লজ্জার কথা—যে ছেলে অঙ্কে লেটার পেয়েছে, বিজ্ঞানে লেটার পেয়েছে, সে দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়তে চায় ! মেডিকেল কলেজ, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অথবা কম্পুটার-সায়েন্স নিয়ে সে পড়বে না !

সুছন্দার সঙ্গে এ নিয়েও দরবার করতে চেয়েছে ; ছেলেটা মায়ের পরামর্শ শোনে। কিন্তু যেমন ছা, তেমন মা। ঋদ্ধির মায়ের সরল জবাব, ওর জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে, কী নিয়ে পড়বে তা ওকেই স্থির করতে দাও !

জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে না ঘোড়ার ডিম !

আসলে ছন্দা চায় ছেলেকে আঁকড়ে থাকতে। বাড়িতে একটি দার্শনিকেই প্রাণ অতিষ্ঠ, আবার একটি এলে ভরাডুবি পূর্ণ হবে।

আর একজন আছেন সর্বনাশের মূলে। ঋদ্ধির দিদা। বাহাত্তর পাড়ি দিয়ে বাহাত্তুরে ধরেছে তাঁকে। আহা ! ছোটখোকন যদি এখানকার কলেজে ভর্তি হতে চায় তাহলে তুই বাগড়া দিস্ কেন ?

কেন যে দেয়, তা কী-করে ঐ বুধাকে বোঝাবে ? ছন্দাকেই বোঝানো গেল না ! এটা বিজ্ঞানের যুগ। এটা কমার্সের যুগ। হয় ফিজিক্স, নয় ইকনমিক্স। কিন্তু কেউই ওর যুক্তিতে কান দিল না। রত্নেশ্বর যেন এ সংসারের মাথা নয় ! কেউই নয় !

ওরা বোঝে না—কোনও দিনই বুঝতে পারবে না—এভাবে বেঁধে রাখা যায় না। সংসারের এই অন্ধ স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করতে না পারলে পক্ষিশাবক কোনোদিনই আকাশচারী মহাগরুড় হয়ে উঠতে পারে না ! ঐ ছোট খোকনের চোখের সামনেই তো রয়েছে একটা জলন্ত উদাহরণ : তার বাপ ! বাপের সঙ্গে রাগারাগি করে এক কথায় ঘর ছেড়েছিল বলেই না আজ সে—রত্নেশ্বর দত্ত !

পারবে না—ঐ স্কলারশিপ পাওয়া ম্যাদামারা ছেলেটা কোনও দিনই পারবে না সেভাবে এক কথায় গৃহত্যাগী হতে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শুধুমাত্র

নিজের হিম্মতে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে !

ফিলজফার হবেন ! বাপের রক্তজল করা টাকার ছত্রছায়ায় বসে বিচার করবেন—'পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র !'

কী-করে পারবে নিজের হিম্মতে প্রতিষ্ঠা খুঁজে নিতে ? আজ পর্যন্ত বাপের চোখে-চোখ রেখে কথা বলতেই শিখল না ছেলেটা !

হোপলেস্ !

না, রতনের ওটা নেহাৎ অন্যায় অভিযোগ ! প্রথমবার চাকরি খুইয়ে মুরারীদা তার বৌঠানের কাছে ধর্না দিতে আদৌ যায়নি। সোজা চলে এসেছিল মরা-কাটাঘর পেরিয়ে ঘূর্ণির রাস্তায়, তার দেড়-কামরার ডেরায়। কল্যাণী রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। বলে, ব্যাপার কী গো ? সূর্যি না ডুবতেই আজ গোয়ালে ফিরে এলে যে ?

বাক্যবাগীশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সাহচর্যে তার কথাগুলোও রসাত্মক।

সাইকেলটা দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে লক-আপ করে মুরারীদা তখন ঘনিয়ে এসে বসেছে। এক টানে ফতুয়াটা খুলে ফেলে পৈতে দিয়ে পিঠ চুলকাতে চুলকাতে বসেছে একটা বেতের মোড়ায়। বল্লে, ছুটি হয়ে গেল যে, গিন্নি !

—ছুটি ? হঠাৎ ছুটি কিসের গো ? কোনও তেমন তেমন কেউকেটার কিছু ভালমন্দ হয়ে যাবার খবর এসেছে নাকি ?

মুরারীদা একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, বুল্স-আই হিট করেছ, গিন্নি ! রবিঠাকুর বেঁচে নেই, থাকলে এই মওকায় তিনি নির্ঘাৎ দু-ছত্তর লিখে ফেলতেন :

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন জিনিস
জীয়ন্তে কৃতান্ত তাই করে দিল finish !

—তার মানে ?

—মৃত্যুহীন জিনিসটা হচ্ছে সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ, সেন্স-অব-হিউমার। আর কৃতান্ত স্বয়ং রত্নেশ্বর দত্ত !

কল্যাণী জানতে চায়, না, মানে মারা গেল কে ?

—কম্পোজিটার শ্রীল শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন রায় !

—ও আবার কী অলুক্ষণে কথা !

—না, না, তোমার শাঁখা-সিঁদুর আন্-অ্যাফেক্টেড ! কম্পোজিটার

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

মুরারী রায় টেঁসে গেলেও বিদূষকদাস মুরারী রায় বহাল-তবিয়ৎ !

এতক্ষণে কল্যাণী উচ্চারণ করে তার বাঁধা বয়ান—যা সে তার বিবাহিত জীবনে হয়তো কয়েক লক্ষবার বলেছে : তোমার একটা কথাও বোঝা যায় না বাপু !

—আজ ছোটবাবু এই বুড়ো-হাবড়াটাকে বরখাস্ত করে দিলেন যে। কাল থেকে আর তোমাকে বিরহ-যন্ত্রণা সইতে হবে না। সারাটাদিন তোমার নজর-বন্দি হয়ে থাকব। 'কপোত কপোতি যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে' !

একগাল হাসল মুরারীদা।

কল্যাণীর বাক্যস্ফূর্তি হল না।

বুড়োটা চোখে ভাল দেখে না, প্রুফ দেখার কাজ যে ইদানিং ঠিক মতো করতে পারে না এটা জানা ছিল। কিন্তু তাই বলে একেবারে বরখাস্ত ! কালীতারা প্রেসের সঙ্গে বুড়োটার যে নাড়ির যোগ ! আর তাছাড়া রতন তো জানে—ওদের তিনকুলে কেউ নেই। এ তো অনিবার্য অনশন মৃত্যু !

কল্যাণীর মনে পড়ে যাচ্ছিল অনেক অনেককাল আগেকার দিনগুলোর কথা। একেবারে আদ্যিকালের। জঙ্গীপুর থেকে গোয়াড়িতে এসে তাদের প্রথম সংসার পাতার স্মৃতি। মুরারীদা তখন দিবারাত্র পড়ে থাকত প্রেসের কাজ নিয়ে। কল্যাণীর সন্তান হয়নি। সদ্যোবিবাহিতার দিন কাটতে চাইত না। শেয়ালডাকা একপ্রহর রাতে মুরারীদা যখন সাইকেলে চেপে ফিরে আসত, তখন কল্যাণী বলত, সারাদিন তোমার কী এত কাজ বল তো ?

—কী করি বল, গিন্নি ? তোমার ছোট বোনটি তো তোমার মতো সরলা নন !

—ছোট বোন ! মানে ?

—ও ! তুমি টের পাওনি বুঝি ? তোমার একটি সতীন হয়েছে যে ! দিব্যি ফুটফুটে মেয়েটি—নাম : কালীতারা !

কল্যাণী হেসে বলত, সে কী ! সে তো আমার 'জা' গো ! রতনের ছোট মা।

—না, না ! দাদা টাকা ঢেলে খালাস ! কালীতারা গাঁটছড়া বেঁধেছে আমার সঙ্গেই !

এই সব কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল।

নখ দিয়ে কিছুক্ষণ মেঝেটা খুঁটল। তারপর জানতে চায়, তোমার অপরাধ ?

—হিমালয়ান্তিক ! শেষমেশ মৃত্যু হল কেউটে সাপের 'ছোবলে' !

কল্যাণী এক-কথা আর বার বার বলল না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মুরারীদা নিজে থেকেই অন্বয়-ব্যাখ্যা দাখিল করে। বললে, বিবেচনা করে দেখ গিন্নি, তুমি ছাড়া এ বুড়ো-বামুনের আছে দু-দুটি কবচ-কুণ্ডল ! কারও হুকুমে কি সে-দুটি ত্যাগ করতে পারি ?

—কী দুটি কবচ-কুণ্ডল ?

এক-নম্বর, গলার বাইরে, বাঁ-কাঁধে কিছু সাদা সুতো। দু-নম্বর, গলার ভিতরে না-কাঁদে কিছু সাদা ছুতো !

—"না-কাঁদে কিছু সাদা ছুতো" মানে ?

—এমন কিছু সাদা রসিকতা যাতে চোখের জল আটকে রাখার ছুতো খুঁজে পাওয়া যায় ! আমার গুরুদেব বলতেন : বিদূষককে কাঁদতে নেই ! তা কান্না রুখতে হলে কিছু রসিকতার ছুতো তো চাই !

কল্যাণী এসব ছেঁদো-কথা এড়িয়ে মোক্ষম প্রশ্নটিতেই ফিরে গেল, তুমি যে দ্বিতীয়বার রতনের দ্বারস্থ হবে না, সেটুকু জানি। কিন্তু কী করবে এখন ? কী-ভাবে···

কথাটা শেষ করতে পারে না। তাতে বুঝতে কিছু অসুবিধা হল না মুরারীদার। গম্ভীর হয়ে বললে, সাইকেলে আসতে আসতে সে-কথাই ভাবছিলাম। সমাধান হয়ে গেছে। আমরা আবার জঙ্গীপুরেই ফিরে যাব। 'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া !'

—জঙ্গীপুর ! অ্যাদ্দিন পরে ? সেখানে কে আছে ?

—খোদায় মালুম। খুব সম্ভবত নিমাই-নেতাই ! গেলেই টের পাব।

নিমাই আর নিতাই মুরারীদার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র। মুরারীদারা দুই ভাই, মুরারীই বড়। ছোট ভাই রমণীমোহনের ঐ দুটি পুত্র সন্তান। বছর আট-দশ আগেও নিমাই-নিতাই ৺বিজয়ার পর জেঠা-জেঠিকে একখানা করে পোস্টকার্ড পাঠিয়ে বার্ষিক প্রণাম জানাত। ইদানিং সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। মুরারীদা যখন দেশ ছেড়ে চলে আসে তখনও রমণী অবিবাহিত। বিমাতা জীবিতা। সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। রমণী লায়েক হবার আগে মুরারীদা যখন যা পারে মনি-অর্ডার করে বিমাতাকে সাহায্য করেছে। তারপর ছোট ভাইয়ের বিয়েতে জঙ্গীপুরে গেছে সস্ত্রীক। মায়ের শ্রাদ্ধেও গেছে, একা। সেও আজ বহুকাল হয়ে গেল। বিমাতা যতদিন জীবিতা ছিলেন—রমণী রোজগেরে হবার পরে—বছর বছর উল্টো পথে মনি-অর্ডার আসত। হিসাব মতো বাস্তু-সংলগ্ন দু-বিঘা জমির অর্ধেকের মালিক

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিধবার সতীন-পো। সে জমিতে আম-জাম-কাঁঠাল-নারকেল বড় কম হয় না। তারই বার্ষিক ফলকরের অর্ধাংশ। ক্রমে সেটা বন্ধ হয়ে যায় ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর। ততদিনে নিমাই-নিতাই লায়েক। জ্যেঠাকে জানিয়েছিল—ইতিমধ্যে বাগান ভরে গেছে আগাছায় আর জঙ্গলে। কেউ আর ফলকর জমা নিতে চাইছে না। বাগান সাফা করতে হলে খরচ করতে হবে। মুরারীদা জবাবে জানিয়েছিল—'এই বুড়ো-বুড়ির দেহান্ত হলে গোটা বাগানটা তো তোমাদেরই বর্তাবে, তোমরাই উদ্যোগী হয়ে ওটা সাফা করাও। খরচপাতির অর্ধেক কেটে নিয়ে বার্ষিক ফলকরের যেটুকু প্রাপ্য সেটুকুই পাঠিও।'

সে চিঠির আর জবাব আসেনি।

ইতিমধ্যে লোকমুখে শুনেছে—নিমাই-নিতাই দুজনেই বিবাহ করেছে। বাপের বৈমাত্রেয় দাদাকে সে-সব কথা জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। এ নিয়ে মুরারীদাও এতদিন মাথা ঘামায়নি। আজ ঘামাতে হল।

কল্যাণী বলল, তাহলে কালই ওদের একখানা চিঠি লিখে দাও।

মুরারীদা হাসে। বলে, তোমার যেমন বুদ্ধি! সে চিঠির জবাব ওরা সাতজন্মেও দেবে না। পঁয়ত্রিশ বছর পরে এই দুই উটকো আপদকে বরণ করে নিতে ওরা কি রসুন-চৌকি বসাবে ভেবেছ?

—তাহলে?

—কাল সকালের লালগোলাঘাট ধরে আমি নিজেই যাচ্ছি। সরেজমিনে তদন্ত করে আসি। কার কাছে যেন শুনেছিলাম, নিমেটা ওখানে থাকে না—কাশীপুর গানশেল ফ্যাকটারিতে কী একটা কাজ করে। নেতাই হয়তো আছে—সে কী করে ঠিক জানি না।

কল্যাণী একটু ভেবে নিয়ে বললে, যদ্দুর মনে পড়ছে পাঠশালা ঘরখানা বাদ দিলে ভিতর বাড়িতে ছিল দুটি চালা। নেতাই কি তার একখানা তোমাকে এক কথায় ছেড়ে দেবে? বিশ্বাস হয়?

—বলা যায় না, গিন্নি। দিতেও পারে!

—তোমার মাথা খারাপ! সে তোমাকে বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না।

—সেটাও সম্ভব। সে-কথাও ভেবে রেখেছি। সে-ক্ষেত্রে কী করব তাও ছকা আছে। সুশীলদাকে মনে আছে তোমার? সুশীল চাটুজ্জে?

—না। কে তিনি?

—ঠিক আমাদের সামনের বাড়িতেই থাকতেন। তাঁদেরই পুকুরে ছান করতে

www.banglabookpdf.blogspot.com

যেতে গো—মনে নেই? উকিলবাবু। নেতাই যদি আমাকে বাড়িতে ঢুকতে না দেয়, তাহলে সুশীলদাকে আমমোক্তারনামা দিয়ে আসব। আমার ভাগের এক বিঘে জমি বেচে দেব। হয়তো সুশীলদা নিজেই কিনে নিতে চাইবেন। জঙ্গীপুর শহর চড়চড়িয়ে বেড়ে গেছে। আমাদের জমি এখন আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে নয়, মিউনিসিপ্যালিটির ভিতর। এখন জমির দাম অন্তত দু-তিন শ টাকা—কাঠাপ্রতি। মানে, আমার জমিটার দামই না হোক হাজার পাঁচেক! সেই হুমকিতে কাজ হলেও হতে পারে। ওরা তো জানে, তোমার-আমার অবর্তমানে ও জমি ওরাই পাবে।

কল্যাণীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এছাড়া আর কোন পথ সে-ও দেখতে পেল না।

মুরারীদা বললে, কাল তোমার-আমার অরন্ধন। তা অসুবিধা হবে না। পাকা কাঁঠালের আধখানা আছে। মা লক্ষ্মীর বাতাসাও আছে। যা হোক করে একটা বেলা চালিয়ে নিও। আমি সন্ধ্যার কেষ্টপুর লোকাল ধরে ফিরে আসব।

জঙ্গীপুরে পৌঁছে রীতিমতো অবাক হয়ে গেল মুরারীদা। আমূল বদলে গেছে সব কিছু। সাইকেলটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ব্রেক ভ্যানে নয়, ভেণ্ডারের গাড়িতে। সে আমলে সাইকেলের জন্যে কোনও টিকিট কাটতে হত না। অর্থাৎ, রেলের আইনে নয়, রেওয়াজে। ইদানিং যেমন এসব লাইনে মানুষের জন্যও টিকিট লাগে না। মানে, টিকিট কাটা হবে কিনা সেটা নির্ভর করে যাত্রীর মর্জির উপর। অথবা স্পেশাল চেকিং হচ্ছে কিনা, এই খবরে। আগেকার দিনে স্টেশান চত্বরে সারি-সারি দাঁড়িয়ে থাকত ঘোড়ার গাড়ি—চার চাকাওয়ালা দু-ঘোড়ার অথবা দু-চাকাওয়ালা এক ঘোড়ার। ইদানিং দেখা যাচ্ছে সাইকেল রিক্সার প্যাঁকপ্যাঁকানিতে স্টেশন চত্বর কলমুখরিত।

মুরারীদা মালকোঁচা সেঁটে রওনা দিল। সবই অচেনা মুখ, অচেনা মানুষ। কেউ তাকিয়েও দেখল না। কেউ ভুরুর উপর রোদ-আড়াল-করা হাতখানা রেখে বললে না, 'চেনা-চেনা লাগছে যেন!'

যেখানে ছিল দরমার বেড়া-দেওয়া একচালা দোকান সেখানে সারি-সারি পাকা কোঠা। অসংখ্য দোতলা-তিনতলা বাড়ি উঠেছে ইতিমধ্যে।

রাধারমণ জিউর মন্দিরটা কিন্তু অপরিবর্তিত। ঠিক যেমনটি ছিল ওর বাল্যকালে। শুধু সে আমলে চত্বরটা ছিল ফাঁকা-ফাঁকা—এখন মন্দির ঘিরে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অসংখ্য বিপণী। এমন কি বেশ কিছু সৌখীন দোকান। গ্লাসকেসে সাজানো।

হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে পড়ল মুরারীদা। সাইকেলটা গচ্ছিত রাখল একটা ফুলওয়ালার জিম্বায়। জুতো জোড়াও খুলে রাখল তার কাছে। ছেলেটা একটা শালপাতায় মোড়া ফুলের ঠোঙা বাড়িয়ে ধরে বললে, সওয়া-পাঁচ আনা।

মুরারীদা বললে, ফুল পরে নেব, তুই আমাকে খানকতক শালপাতা দে তো?

—শালপাতা? কী করবেন দাদু?

—খাব। যা বলছি দে না। দাম দেব।

ছেলেটা অবাক মানে। শালপাতার গুচ্ছো হাতে নিয়ে এবার মুরারীদা এগিয়ে গেল সামনের একটা চায়ের দোকানে। বললে, আমাকে একটা মাটির ভাঁড় দিও তো ভায়া, চা চাই না। শুধু ভাঁড়।

এবারেও দোকানি অবাক হয়। বলে, কী করবেন দাদু?

দাদু! সবাই ডাকে 'দাদু'। তা খদ্দেরের বয়স যাই হোক। সে আমলে অপরিচিত খরিদ্দারকে সবাই বলত 'বাবু'; সম্মান দেখাতে 'বাবুমশাই'। দোকানি বললে, এখানে কাচের গ্লাসে চা সার্ভ করা হয়, দাদু। মাটির ভাঁড় এখানে পাবেন না।

মুরারীদা উদ্যোগী পুরুষ—শেষমেশ দশ নয়া দিয়ে দই-মিষ্টির দোকান থেকে একটা পাঁচশ-গ্রাম দই-এর—ইদানিং আবার সের-পোয়া বোঝে না কেউ—ভাঁড় নিয়ে টিউকলের দিকে এগিয়ে গেল। মুখ হাত ধুয়ে এক ভাঁড় জল নিয়ে চলল রাধারমণ জিউ মন্দিরের দিকে।

হোক অর্ধশতাব্দীর ব্যবধান—চিহ্নিত পাথরখানা ঠিকই খুঁজে বার করল সে। মন্দির সোপানের শেষ ধাপে, উত্তর-পশ্চিম কোণের দ্বিতীয় পাথরখানা। জল-কাদা পদচিহ্নে ধবধবে শ্বেত পাথরখানা ধূসরবর্ণের। মুরারীদা উবু হয়ে বসল নিচের ধাপে। ভাঁড় থেকে জল ঢেলে শালপাতা দিয়ে ঘষে ঘষে মর্মর-ফলকের মালিন্য ধুইয়ে দিল। অযুত-নিযুত ভক্তযাত্রীর পদচিহ্ন রেখার তলায় সাদা পাথরের উপর কালো-আখরে লেখা অক্ষরগুলো ফুটে উঠল ক্রমে।

মুরারীদার হাফ-প্যান্ট-যুগে—না, তারও আগে, ঘুন্সিযুগে, যখন সে নেংটু-বিশু-শিবেদের সঙ্গে ড্যাংগুলি খেলত, তখন এই পাথরখানা বসিয়েছিলেন তার টুলো পণ্ডিত পিতৃদেব—মাতৃ স্মৃতিতে। হরে নাপিতের দরুন জমিটা বিক্রি করে। বারে বারে ভাঁড়ে করে জল এনে ঝকঝকে করে তুলল ক্রমে। দেখা গেল, ভক্ত-পদচিহ্নের তলায় আজও অম্লান হয়ে আছে আখরকটা। অর্ধচন্দ্রাকারে

www.banglabookpdf.blogspot.com

লেখা 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' আর তার নিচে 'স্বর্গগতা জননী কাত্যায়নীদেবীর শান্তিকামনায় এই স্মৃতিফলক উৎসর্গীকৃত—অধম পুত্র শ্রীপীতাম্বর দেবশর্মনঃ (রায়)'। তার নিচে: 'অক্ষয়তৃতীয়া, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।'

মুরারীদা ঠিক মতো পড়তে পারছিল না। না, সাদা পাথরে কালো হরফ-গুলো যথেষ্ট বড় মাপের—বলা যায়, ছত্রিশ-পয়েন্ট, বোল্ড! সেজন্য নয়, চোখের জলে ওর ছানিপড়া চোখ দুটি তখন ভেসে যাচ্ছে যে। কোঁচার খুঁটে চশমাটা মুছে আবার নাকে চড়ালো। গড় হয়ে মাথা ঠেকালো সেই পাথরখানায়।

রাধারমণ জিউর মূর্তিতে কিন্তু তিলমাত্র পরিবর্তন হয়নি। তাঁর হাসিটিও অমলিন আছে অর্ধশতাব্দী ধরে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নিজের বাস্তুভিটেয় পৌঁছে। এ কাদের বাড়ি?

৺পীতাম্বর রায়ের লাল-টালি ছাওয়া পাঠশালা ঘরখানা নিশ্চিহ্ন—তার পিছনে পুব-দুয়ারী বাবামশায়ের শয়নকক্ষ সংলগ্ন ঠাকুরঘর, দক্ষিণ-দুয়ারী চালাঘর—কিচ্ছু নেই। তার পরিবর্তে সে জমিতে দাঁড়িয়ে আছে একটি দ্বিতল মোকাম। সামনে এক-চিলতে ফুলবাগান, গেট। ফলকে গৃহস্বামীর নাম লেখা: বিশ্বনাথ পাল। পূর্ব-জমানায় যেগুলিকে বলা হত আমবাগান, বাঁশবাগান, কাঁঠালতলা—সেগুলি ছোট ছোট প্লটে ভাগ করা হয়েছে। খান-চার-পাঁচ একতলা বাড়ি উঠে গেছে সেই ভূতপূর্ব-উদ্যানে। মুরারীদা বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। আশপাশে তাকিয়ে দেখল—না, হারু ঘোষের ভিটেখানাও নিশ্চিহ্ন, নিশু আঢ্যির বাস্তুটাও বেপাত্তা। গেট খুলে ভিতরে ঢুকতে যাবে অন্দরমহল থেকে শোনা গেল তাঁর সারমেয় গর্জন।

থমকে গেল মুরারীদা।

সদর দরজা খুলে গেল। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, খালি গা, পরনে লুঙি, দূর থেকেই প্রশ্ন করেন, কাকে চাই?

মুরারীদা প্রতিপ্রশ্ন করে, ভিতরে আসব? কুকুর বাঁধা আছে?

ভদ্রলোক সদর দরজার বাইরে বেরিয়ে এলেন। পিছনে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে বললেন, আসুন। কাকে খুঁজছেন?

সাইকেলটা লক-করে মুরারীদা এগিয়ে এল। বললে, নিতাই রায় বা নিমাই রায় কি এখানে থাকে?

—না তো! কোথা থেকে আসছেন আপনি?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মুরারীদা সে-কথার জবাব না দিয়ে জানতে চায়, আপনি রমণীমোহন রায়ের দুই পুত্র—নিতাই বা নিমাই-এর নাম শোনেননি ?

ভদ্রলোক মুরারীদাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, শুনেছি। নিতাই রায় মারা গেছেন, নিমাই রায় এখানে থাকেন না। আপনি কে ?

—আমি ওদের জ্যেঠা। নিমাই কোথায় থাকে বলতে পারেন ?

—ঠিক জানি না। শুনেছি, কাশীপুরের ওদিকে। জমি বেচে দেবার আগে থেকেই নাকি সেখানে থাকত।

—আপনি কি দু-বিঘে জমিই কিনেছেন ?

ভদ্রলোক গম্ভীর হলেন। বলেন, সে খোঁজে আপনার কী প্রয়োজন ?

—না, মানে, গোটা দু-বিঘে জমি তো নেতাইয়ের ছিল না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ভদ্রলোক কী যেন আশঙ্কা করলেন। গম্ভীর হয়ে বলেন, অ। তা সে যাই হোক—ওরা কেউ এখানে থাকে না।

সদর খুলে উনি ভিতরে গেলেন। আবার তীব্র সারমেয় গর্জন শ্রুত হল। কবাট বন্ধ হয়ে গেল।

মুরারীদা গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। চারিধারে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। জননীকে তার মনে পড়ে না, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির কেউ আজ তাকে চিনতেই পারছে না। সিধু মোড়লের বাড়ির গায়ে ছিল ওদের গাম্বু। মার্বেল খেলার। গাম্বুটাতো ছাড়—সিধু মোড়লের গোটা বাড়িখানাই বেপাত্তা। কিন্তু না, সুশীলদার সেই সাবেক দ্বিতল বাড়িখানা খাড়া আছে। পলেস্তারা খসে খসে কিছু হাড়-পাঁজরা বের হয়ে পড়েছে, এই যা। সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে সেদিকেই এগিয়ে আসে। সুশীলদার বাড়ির দেওয়ালে সেই মার্বেল-ফলকটাও অপরিবর্তিত। ইংরেজি হরফে লেখা: 'এস. কে. চ্যাটার্জী, অ্যাডভোকেট'। বারান্দায় গেঞ্জি গায়ে একটি যুবক ইজি-চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। ফতুয়া-গায়ে বেঁটে-খাটো মানুষটিকে এগিয়ে আসতে দেখে কাগজখানা নামিয়ে প্রশ্ন করে, কাকে চাই ?

—উকিলবাবুকে।

—আমিই। বলুন ?

—না, মানে আমি এস. কে. চ্যাটার্জী অ্যাডভোকেটকে খুঁজছি।

—বললাম তো। আমিই। বসুন। বলুন ?

www.banglabookpdf.blogspot.com

মুরারীদা জমিয়ে বসল। এতক্ষণে চিনতে পেরেছে। এ নিশ্চয় সুনীল, সুশীলদার বড় ছেলে। এতদিনে ওকালতি পাশ করে বাপের পসারটা নিয়ে জমিয়ে বসেছে। কৌতুকপ্রিয় মানুষটার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরে এল। বললে, আপনি যে কায়কল্প করেছেন তা তো খবর পাইনি, চাটুজ্জে মশাই ?

যুবক সোজা হয়ে উঠে বসে। বলে, মানে ?

—বাঃ! আপনি আমার চেয়ে যে বছর-পাঁচেক বড়ই ছিলেন সুশীলদা! আপনার টাকে দিব্যি কুচকুচে চুল গজিয়েছে দেখছি !

যুবক দুরন্ত বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়। চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে যায়। অস্ফুটে বলে, মুরারীকাকা ?

—চিনেছ তাহলে! তুমি তো সুনীল ? দাদা ?

—সে তো বছর পাঁচেক হয়ে গেল। বাবা গত হয়েছেন। কিন্তু আপনি, মানে···আপনি বেঁচে আছেন ?

মুরারীদা প্রাণখোলা হাসি হাসে এতক্ষণে। বললে, এ তো দারুণ এক দার্শনিক প্রশ্ন! এখন আছি কি না জানি না—সকাল পাঁচটা বেয়াল্লিশ পর্যন্ত ছিলাম। গিন্নির মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা স্বচক্ষে দেখে এসেছি! ফিরে গিয়ে যদি দেখি তিনি থান পরেননি···

—কিন্তু মানে···কী আশ্চর্য !

—আশ্চর্য তো বটেই! কীমাশ্চর্যমতঃপরম! এখনো আমরা বেঁচে আছি !

—তা নয় মুরারীকাকা, কিন্তু নিমাই যে আপনার ওয়ারিশ হিসাবে গোটা দু-বিঘেই বেচে দিল।

বিদূষককে কাঁদতে নেই; কিন্তু গম্ভীর হতে দোষ কি ?

মুরারীদা বললে, সে কি জ্যাঠার শ্রাদ্ধও করেছিল ?

—না, তা নয়; কিন্তু বাপের দরুন এক বিঘে আর জ্যেঠার ওয়ারিশ হিসাবে এক বিঘে, দু-বিঘেই যে রেজিস্ট্রি করে বিশু পালকে বেচে দিল !

—তোমার বাবা তখন বেঁচে ?

—হ্যাঁ। বায়নানামার পরে এ জমিতে একমাস নোটিস টাঙানো ছিল। আপনি রানাঘাটে কোন ছাপাখানায় কাজ করেন শুনে বাবা সেখানেও লোক পাঠিয়েছিলেন। আপনার পাত্তা পাননি।

—স্বাভাবিক। আমি রানাঘাটে থাকি না। সে যা হোক, নিমু যখন জমিটা বেচে তখন কি নেতাই বেঁচে ?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

—না কাকা, নিতাইদা তার আগেই মারা যায়।

—তার সন্তানাদি ?

—হয়নি।

—তা নেতাইয়ের বিধবা বউ কি জমি-বিক্রি টাকার অর্ধেক পেয়েছিল ?

—তা তো জানি না। কেন বলুন তো ?

ম্লান হাসল মুরারীদা। বলল, নিতাইয়ের বউকে আমি দেখিনি। নামও জানি না। তবু সে এ বংশেরই বধূ তো! ৺পীতাম্বর রায়ের নাত-বৌ! সে হতভাগী তার ন্যায্য পাওনাটা পেয়েছে জানলে একটু সান্ত্বনা পেতাম, এই আর কি।

সুনীল সোজা হয়ে বসে। বলে, না, মুরারীকাকা! এতবড় তঞ্চকতা আমি সহ্য করব না। আপনি একটা কেস ঠুকে দিন!

—অভিসম্পাত দিচ্ছ ?

—অভিসম্পাত ?

—নয় ? লোকে তো শাপ-শাপান্ত করতেই বলে, 'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক!' —আর তাছাড়া মামলা লড়ার সামর্থ্যই কি আমার আছে ছাই ?

সুনীল উঠে দাঁড়ায়। সে রীতিমতো উত্তেজিত। বারান্দায় বারকয়েক পায়চারি করে। বাঁ-হাতের তালুতে ডান-হাতে মুষ্ট্যাঘাত করে। তারপর ফিরে এসে মুরারীদার হাত দুটি তুলে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে বলে, কাকা, আপনাকে এক পয়সাও খরচ করতে হবে না। আপনি আমাকে 'স্পেশাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি'' দিয়ে যান। আজই। আমি দেখে নেব! সব খরচপাতি আমার। মামলা জিতলে আপনার যা মন চাইবে আমাকে আশীর্বাদী দেবেন।

—আর হারলে ?

—সে আমার দায়।

—আর জিতে যদি তোমাকে লবডংকা দেখাই ?

সুনীলের হঠাৎ খেয়াল হল—দুরন্ত বিস্ময়ে এতক্ষণ তার মুরারীকাকাকে প্রণাম করা হয়নি। পায়েরধুলো নিয়ে বলে, সে আপনার হিম্মতে কুলাবে না, মুরারীকাকা। আমি জানি। অতটা moral courage আপনার নেই। আপনি যে দাঁঠাকুরের চেলা!

হঠাৎ মুরারীদার চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। জন্মভূমির একটি মানুষ অন্তত তাকে চিনতে পেরেছে! চশমাজোড়া খুলে কোঁচার খুঁটে মুছে নেয়।

সুনীল রহস্য করে বলে, এ কী মুরারীকাকা? আপনার চোখে জল?

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিদূষকের চেলার নাকি কাঁদতে নেই ?

এবার হেসে ফেলে। বলে, ওটা তোদের ভুল ধারণা রে সুনীল। বিদূষকদের কাঁদতে নেই—দুঃখে। আনন্দেও যদি না কাঁদব তবে ভগবান চোখের কোলে এ আপদ পয়দা করবেন কেন, বল্? জঙ্গীপুরে আসার পর এই প্রথম তাঁর নাম শুনলাম তো! আর তাছাড়া 'moral courage'-এর যে ইন্টারপ্রিটেশান দিলি, সেটাও অভিনন্দন করা দরকার!

—তাহলে ?

—না রে। আমি রাজি নই। ভেবে দেখ, বিশ্বনাথ পাল তো অন্যায় কিছু করেননি।

—কিন্তু নিমাই রায়? সে কেন হলপ নিয়ে বলল, তার জ্যেঠা মৃত ?

মুরারীদা শুধু বললে: ছিঃ!

সুনীল বুঝতে পারে—বংশের এ কলংকের কথা মুরারীদা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। বললে, তাহলে মুখ বুজে সয়ে যাবেন ?

—তুই আমার একটা উপকার করবি সুনীল ?

—বলুন, কাকা ?

—খর্চাপাতি দেবার সামর্থ্য আমার নেই। তবে তোর বাবা, সুশীলদা এককালে ৺পীতাম্বর রায়ের পাঠশালায় পড়েছিলেন—মনে কর এটা তাঁর হয়ে তোর গুরুদক্ষিণা—

—বলুন না খুলে ?

—খোঁজ নিয়ে দেখ্, নেতাই-এর বিধবা তার ন্যায্য পাওনা পেয়েছে কি না। না পেয়ে থাকলে আমার নামে নিমুকে হুমকি দে। ৺ঠাকুর কেউটে সাপকে 'ছোবল' দিতেই বারণ করেছিলেন। ফোঁস করতে দোষ কি ?

সুনীল এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

অনুরোধ করল তার বাড়িতেই মধ্যাহ্ন আহারটা সারতে।

রাজি হল না মুরারীদা। বললে, আজ আমাদের স্বামী-স্ত্রীর একটা ব্রত চলছে—অরন্ধনের। তবে চা-টা খাব। বৌমাকে বল।

কেষ্টপুর-লোকাল থেকে সাইকেলটা নামিয়েই নজর হল প্ল্যাটফর্মে ঋদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে।

—কী রে? তুই স্টেশানে? এ ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছিস?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

—না দাদু, তোমাকে রিসিভ করতে এসেছি।

—আমাকে রিসিভ করতে ? তা ফুলের মালা কই ? ব্যাণ্ডপার্টি কই ?

—আগে বাড়িতে চল, ফুলের মালা নিয়ে তোমার বোঠান বসে আছে !

—মানে ?

—দিদা তোমার ওপর ক্ষেপে ব্যোম্ ! বলেছে, ধরে আনতে না পারলে বেঁধে আনিস্ !

—যা শ্বাবা ! তা আমি যে এ ট্রেনে ফিরব তা জানলি কী করে ?

—বাড়িতে চল, সব শুনবে।

মুরারীদা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে—সন্ধ্যা পাঁচটা সাতান্নর কেষ্টপুরের লোকালটা চলে যাবার আধঘণ্টার মধ্যে সে যদি সাইকেলে চেপে বাড়িতে না পৌঁছায় তাহলে ঋদ্ধির বেতো-দিদা মাথা কুটতে শুরু করবে।

ঋদ্ধি বলে, করবে না। ছোট দিদাও জানে, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করতে স্টেশানে আসব।

অগত্যা। দুজনে দুটি সাইকেল নিয়ে রওনা দিল হাইস্ট্রীটের দিকে। ওকে পেঁাছে দিয়েই ঋদ্ধি হাওয়া। রতনের মা খুব বকাবকি করলেন মুরারীকে : সাপের পাঁচ-পা দেখেছ তোমরা ? আমি কি মরে গেছি ?

তাঁর একটা অভিযোগের কৈফিয়ৎ সত্যিই দিতে পারল না মুরারীদা : বোঠানের পায়ের ধুলো না নিয়ে, বোঠানের দেওয়া বিল্বপত্র পকেটে না গুঁজে সে কেন ট্রেনে চাপে ?

বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল মা-জননীর কাছে। শোনা গেল, কাল রাত্রেই প্রেস থেকে বংশী এসে দুঃসংবাদটা দিয়ে যায়। আজ সকালেই শাশুড়ীর হুকুমে সুছন্দা ঋদ্ধিকে সাইকেলে করে পাঠিয়েছিল মুরারীদাকে ধরে আনতে। কিন্তু ঋদ্ধি তার দেখা পায়নি। তার আগেই মুরারীদা ট্রেন ধরতে রওনা হয়ে গেছে। কল্যাণীর কাছে খবর পাওয়া গেল, সন্ধ্যার পাঁচটা সাতান্নর লোকালে মুরারীদা ফিরবে। টিফিন-কেরিয়ারে করে খাবার পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে কল্যাণী নাকি জানিয়েছিল—ওদের স্বামী-স্ত্রীর কী একটা অরন্ধনের ব্রত আছে—সূর্য ডোবার পর খাবে।

সুছন্দা আরও জানায়—তারপর সে টিফিন-কেরিয়ারে করে দুজনের রাতের খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। মুরারীদাকে আশ্বস্ত করে, রান্না-বান্না সব করেছে বামুনদি। কোনও ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়নি। তাছাড়া ঋদ্ধি নয়, খাবারটা পেঁাছে

দিয়ে এসেছে পাঁড়েজী।

মুরারীদা অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার মা-জননীর দিকে। গলকণ্ঠটা বারকতক ওঠানামা করল শুধু।

সুছন্দা বলে, আজ আপনি সারাদিন অভুক্ত আছেন। যান, বাড়ি যান। কাকিমাও আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই একবার সুবিধা করে আসবেন কাকু। আপনার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে।

মুরারীদা ইতিউতি দেখে নিয়ে বললে, ফিরে গিয়ে যখন উনুন ধরাতে হচ্ছে না, তখন বাখেড়াটা চুকিয়েই যাই। চল, তোমার ঘরে চল। শুনি তোমার গোপন কথাটা। সুছন্দা ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। রতনের ঘর নয়, তার নিজের শয়নকক্ষে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ঋদ্ধির ব্যবহারে ইদানিং আমি কেমন যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখছি কাকু। ও'কে বলিনি—জানেনই তো, ও'র চণ্ডালে রাগ···

—অমঙ্গলের ছায়া ? প্রেম-ট্রেম ?

—না, না, সেসব কিছু নয়। আপনি যতীনের কথা শুনেছেন ? যতীন সোম ?

যতীন সোম এখন বিখ্যাত। অনেকদিন পর এই মফঃস্বল থেকে একটি ছেলে হায়ার-সেকেণ্ডারিতে প্রথম দশজনের একজন হয়েছে। তার চেয়েও অবাক করা খবর—সে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হতে যায়নি। মুরারীদা বললে, যতীন ? না। কী ?

—যতীন অ্যাবস্কণ্ড করেছে। পুলিসে খুঁজছে তাকে।

মুরারীদা স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, সে তো হীরের টুকরো ছেলে ! সে তো কোন অন্যায় করবে না। কী চার্জ তার বিরুদ্ধে ?

—রাষ্ট্রদ্রোহিতা। যতীন 'নকশাল' হয়ে গেছে !

শব্দটা অচেনা নয়। সংবাদপত্রে নিত্য বার হচ্ছে বিচিত্র সব খবর। খ্যাপা হাওয়া উত্তর বাঙলা থেকে কলকাতা হয়ে এই মফঃস্বল সদর-শহরেও এসে পেঁাচেছে। মায়, কাগজে ছবিও বার হয়েছে—কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির···

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মুরারীদার। বললে, ঠিক আছে মা, আমি খবর নেব। চোখে-চোখে রাখব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তো আছি—

মুরারীদা উঠে দাঁড়ায়। যেতে গিয়েও কী ভেবে হঠাৎ ফিরে আসে। বলে,

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটা কথা মা-জননী—

—বলুন ?

—ঋদ্ধির পাশের খাওয়াটা আমার পাওনা আছে। একদিন বুড়ো-বুড়ি এ বাড়ি এসে পাত পেড়ে খেয়ে যাব কিন্তু।

সুছন্দা অবাক হয়। সামলে নিয়ে বলে, নিশ্চয়ই। বলুন? কবে আসবেন ?

—যেদিন তোমার সময় হবে। তবে একটা শর্ত আছে।

—শর্ত! কী শর্ত ?

—তোমাকে নিজে হাতে পরিবেশন করতে হবে!

সুছন্দা স্তম্ভিত। বলে, আপনি, মানে, আমার ছোঁওয়া খাবেন ?

কৌতুক চিক্‌চিক্‌ করে ওঠে বৃদ্ধের ছানি-পড়া চোখ দুটোয়। নিজের অজান্তেই হঠাৎ 'তুমি' ছেড়ে 'তুই'-এ নেমে আসে। যেন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। বললে, না তো কী? তুই কি ভেবেছিলি—দা'ঠাকুর আমাকে হাতে-ধরে তালিম দিয়েছিলেন—ছুঁৎমার্গে ?

ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন মুরারীদা রাজনীতি নিয়ে কিছুটা মাথা ঘামাতো। একবার জঙ্গীপুর সংবাদ প্রেস থেকে দা'ঠাকুরকে লুকিয়ে বিপ্লবীদের কিছু গোপন প্রচারপত্র ছাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। শেষমেশ ধরা পড়ে যায়। পুলিসের কাছে নয়, প্রেস-মালিকের কাছে। দাদাঠাকুর ওকে মারতে বাকি রেখেছিলেন। 'আর কখনো করব না' বলে ক্ষমা চেয়েও বেচারী নিষ্কৃতি পায়নি। দাদাঠাকুর রেগেমেগে ছাপানো কাগজের পুলিন্দাটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই ওকে বলেছিলেন, যা! এক্ষনি বিদায় হ! তোর মুখদর্শন করব না।

মুরারীদা এতটা আশংকা করেনি। বুঝতে পারেনি—এই অপরাধে উনি ওকে একেবারে চিরকালের জন্য বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন—ঐ ঝড়-বাদলের রাত্রে।

অবাক হয়ে বলেছিল, বিদায় হব ? এই ঝড়ের মধ্যে ?

—হবে না ? ভোর রাতে প্রেস যদি সার্চ হয় ? যাও! কোথায় তোমার স্যাঙাৎরা বন-জঙ্গলে লুকিয়ে আছে তাদের হাতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এস! আমারই হয়েছে জ্বালা! দুধকলা দিয়ে কী সাপই পুষেছি!

www.banglabookpdf.blogspot.com

তত্ক্ষণে বুঝতে পেরেছিল মুরারীদা। গুরু তাকে তিরস্কার করছেন না—ঝড়-বাদল মাথায় করে ওকে ঘরের বার করে দেবার অন্য উদ্দেশ্য আছে তাঁর।

তা, সেসব অনেক-অনেক কাল আগেকার কথা। তারপর ভারত স্বাধীন হয়েছে। মুরারীদা ইদানিং রাজনীতির ধারে-কাছে নেই। খবরের কাগজও রোজ পাতা উল্টে দেখে না।

কিন্তু খবরের কাগজ না পড়লেই কি রেহাই পাবে ? খবরের কাগজ তো পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। হরফও স্মল-পাইকা—আট থেকে দশ পয়েন্ট! কিন্তু গোয়াড়ি-গঞ্জে পথেঘাটে দেওয়াল-লিখন না পড়ে যাবে কোথায় ? একটি পয়সা খরচ নেই, চোখ তুললেই নজর পড়ে। বিঘৎ-আকারের বড় বড় হরফ: 'নকশাল-বাড়ি লাল-সেলাম।' আচ্ছা 'সেলাম' তো একটা ক্রিয়াপদ! যেমন 'গান-গাওয়া।' 'লাল-গানে নীল-সুর' হয়—কোথায় যেন পড়েছে। তাই বলে 'সেলাম' কখনো লাল হয়! মাথা খারাপ ছোঁড়াগুলোর। পড়াশুনার ধারে-কাছে নেই! কিন্তু! যতীন ছোঁড়া তো জলপানি পাওয়া ছেলে! ঋদ্ধিও পড়াশুনায় দারুণ দড়। ওরা কেন ভাষা নিয়ে এই সব যথেচ্ছাচার করে: লাল সেলাম! তার চেয়েও আর একটা আজব স্লোগান: 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।'

কোন মানে হয় ? চীন একটা ভিন্ন রাজ্য। ভারতের উত্তরে। মাঝখানে খাড়া আছে মহা-হিমালয়। এ তোমার বনগাঁ বর্ডার নয়, যে এক-পা ভারতে এক-পা পূর্ব-পাকিস্তানে রেখে বলবে: 'পা-ফাঁক করে সিগারেট খেতে বড্ডই ভালবাসি!' সেই হিমালয়-ডেঙানো চীন দেশের চেয়ারম্যান হয়ে গেল তোদের চেয়ারম্যান! এবার কোনদিন বলে বসবি: পরসীর বাবা আমার বাবা!

পাগল সব! বদ্ধ উন্মাদ!

পরদিন মুরারীদা যখন তার নির্দিষ্ট টুলে গিয়ে বসল, হাজরির খাতাখানা টেনে নিয়ে আঁকা-বাঁকা হরফে সই দিল, তখন কেউ আপত্তি করেনি। তার পরদিন ঋদ্ধি নিজে হেকেই দেখা করতে এল। প্রেস তখন ছুটি হয়ে গেছে। কর্মীরা সবাই চলে গেছে। মুরারীদা একা-হাতেই সব বন্ধ-ছন্দ করে ঝাঁপ ফেলার আয়োজন করছে। রাত তখন আটটা। হঠাৎ ঋদ্ধির আবির্ভাবে একটু অবাক হয়। বলে, তুই এ সময় ? কিছু বলবি ?

—হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম দাদু।

—বল্ ?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

—শোন। রোজ কলেজ-ফের্তা আমি প্রেসে আসব। তুমি যেগুলোর প্রিণ্ট-অর্ডার দিয়েছ তা বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দেবে। আমি নিয়ে যাব। পরদিন কলেজ যাবার পথে আবার তোমাকে দিয়ে যাব। বুঝলে ?

মুরারীদা অবাক হয়ে বলে, মানে ?

—প্রুফ-দেখা ব্যাপারটা আমি শিখে ফেলেছি, দাদু। সুবল-মিত্তিরের অভিধানের পিছনেই তো আছে। তবে তোমার-আমার এ গোপন-ব্যবস্থা কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। শীতকাল পর্যন্ত। এই শীতে তোমাকে ছানিটা কাটাতে হবে ! ভয় কি ? কত লোকেই তো ছানি কাটাচ্ছে।

মুরারীদার চোখে জল এসে যায়। বলে, অপারেশনের ভয়ে নয় রে দাদু। চোখ কাটাতে হলে আমাকে তিন-চারদিন শুয়ে থাকতে হবে। তোর দিদা—

—কেন আমরা কি সব মরে গেছি ?

—ষাট বালাই। তবে তোর কথা শুনতে পারি, যদি তুই আমার কথা শুনিস !

—তোমার কোন কথাটা কবে আমি শুনিনি দাদু ?

—তাহলে কথা দে, যতীনদের সঙ্গে তুই কোনও সম্পর্ক রাখবি না।

ঋদ্ধি অবাক হয়ে গেল। পিছন ফিরে দেখে নিল শ্রুতিসীমার মধ্যে কেউ আছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, কেন দাদু ? যতীন কি খুব খারাপ ছেলে ?

—না, তা নয়। কিন্তু ওরা যেসব কাণ্ড-কারখানা করছে, তা তো ভাল নয় ?

—তুমি জান, যতীনরা কী করছে, কেন করছে ?

—না, জানি না। কিন্তু সবাই তো বলছে সে-সব কাজ খারাপ ! যারা আমার মতো অশিক্ষিত নন, যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরাও তো সে-কথা বলছেন ! www.banglabookpdf.blogspot.com

—একটা কথার জবাব দাও তো দাদু। তুমি যখন জঙ্গীপুর-সংবাদের প্রেসে লুকিয়ে-লুকিয়ে বিপ্লবীদের জন্যে গোপন লিফলেট ছাপতে তখন দেশের যাঁরা জ্ঞানী, পণ্ডিত তাঁরা কী বলতেন ?

—সে-কাল আর এ-কাল ? তখন দেশ পরাধীন ছিল। আর তাছাড়া সে-আমলের বিপ্লবীরা তো দেশনেতাদের মূর্তি ভাঙতে চায়নি।

ঋদ্ধি একটু ভেবে নিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে এ নিয়ে একদিন কথা বলব দাদু। পরের মুখে ঝাল খেও না। নিজে শোন, নিজে দেখ। আমার বিশ্বাস,

www.banglabookpdf.blogspot.com

তারপর তুমি নিজেই একদিন আমার হাতে নিষিদ্ধ পুঁটলিটা তুলে দিয়ে ঝড়-বাদলের রাতে আমাকে খোলা দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলবে, 'যা ! এক্ষণি বিদায় হ ! তোর মুখদর্শন করব না !'

মুরারীদা কী জবাব দেবে বুঝে ওঠার আগেই ছেলেটা হাওয়া !

তারপর থেকে ঋদ্ধি সকাল-সন্ধ্যা দু-বার করে প্রেসে আসে। প্রুফ নিয়ে যায়, দিয়ে যায়—কিন্তু ঐসব গোপন কথা আলোচনার সুযোগ হয় না।

মাসকয়েক কেটে গেল এভাবে।

মুরারীদা ঋদ্ধির বন্ধু-বান্ধবদের বাজিয়ে দেখেছে। কল্যাণ, সুখময়, দিব্যেন্দু। তারা কেউ মুখ খোলেনি। কে যে ওদের দলে আছে, কে নেই, তা বোঝা যায় না। www.banglabookpdf.blogspot.com

যতীনের পাত্তা সে পায়নি। যতীনের বাড়িতেও গিয়ে খোঁজ নিয়েছে। তাঁরাও কিছু জানেন না। কোন চিঠিপত্র পাননি তাঁরা। যতীন যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। বেঁচে আছে কিনা তাই জানে না কেউ।

ঋদ্ধি নিজেও যে কতটা জড়িয়ে পড়েছে তা বোঝা গেল না। সুছন্দার সঙ্গে এরমধ্যে একদিন মাত্র দেখা হয়েছিল। যেদিন দত্তবাড়িতে ওর মধ্যাহ্ন-আহারের নিমন্ত্রণ হল। সেদিন রত্নেশ্বর ঘটনাচক্রে কলকাতায়। অথবা কে-জানে সুছন্দা বোধকরি সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল এতদিন। কিন্তু সে দিন এ-সব কথা নিয়ে মা-জননীর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হয়নি।

একদিন সুযোগ করে মুরারীদা গিয়ে হাজির হল করুণাময়বাবুর ডেরায়। অধ্যাপক করুণাময় মজুমদার পণ্ডিত ব্যক্তি। অমায়িক। জিজ্ঞাসুকে কখনো বিমুখ করেন না। মুরারীদার প্রশ্নে একটু বিস্মিত হলেন—কিন্তু সে কেন এসব কথা জানতে চায়, তা জিজ্ঞাসা করলেন না। মুরারীদার বোধগম্য ভাষায় তদানীন্তন বঙ্গ-রাজনীতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। এবং বিশ্লেষণও।

বললেন, ওদের সব ক্রিয়াকর্মে আমার অনুমোদন নেই, মুরারীবাবু। কিন্তু এ-কথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, ওদের দলে 'টুকে-পাস-করা' ছাত্র নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝাঁক হীরের টুকরো ছেলে হঠাৎ এ-পথটা বেছে নিল কেন ? কী তাদের বক্তব্য ? কেন ওরা বলছে—এ আজাদী ঝুটা, এই ভোটাভুটি নিরর্থক ?

—তাই বলে ওরা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, নেতাজীর মূর্তি…

বাধা দিয়ে করুণাময় বলে ওঠেন, মুরারীবাবু, তোমার ঘাড়ে যদি একটা

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

টিকটিকি বা আরশোলা পড়ে তাহলে তুমি লাফিয়ে উঠবে। যত জোরে হাত-পা ছুঁড়বে অতটা জোর খাটানো অযৌক্তিক! নয় কি? আর সে সময় তোমার হাতের ধাক্কা লেগে যদি একটা চীনেমাটির সুন্দর ফুলদানি চুরমার হয়ে যায় তাহলে দোষ কার?

মুরারীদা কিছুই বুঝতে পারে না। এখানে তেলাপোকাই বা কে? আর ফুলদানিটাই বা কী?

করুণাময় বলেন, আমার ধারণা—ওদের দলের সকলেই এই মূর্তি-ভাঙার প্রোগ্রামটা অনুমোদন করে না। যারা করে, যে ছেলেটি নিজে হাতে ঐ মূর্তি ভেঙেছে—খোঁজ নিলে হয়তো দেখবে সেও ইউনিভার্সিটির এক উজ্জ্বল রত্ন। ঐ বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দের উপর প্রবন্ধ লিখে সে রেকর্ড-মার্কের অধিকারী! তাহলে সে কেন এ কাজ করল? বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা নেতাজীকে সে ছেলেটি হয়তো তোমার-আমার চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করে!

—তা হলে সে ও-কাজ করল কেন?

—যেহেতু সে মনে করে ঐ মূর্তিগুলিকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে একদল রাজনৈতিক নেতা আমাদের মোহগ্রস্ত করে রাখতে চান! তারা দেশ শাসনের নামে দেশ শোষণ করছে, আর বৎসরান্তে ঐ মূর্তির গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে আমাদের বিদ্বেষবহ্নি প্রশমিত করছে!

—তার মানে ওদের ঐ-সব কাজ আপনি সমর্থন করেন?

—না! নিশ্চয় নয়! হাজারবার নয়! লক্ষবার নয়! আমি শুধু ওদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম, মুরারীবাবু।

ওর মাথায় কিছুই ঢুকল না। কিন্তু সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল নিশ্চয়। না হলে জুৎসই রসিকতা একবারও করতে পারল না কেন?

বছরখানেক পরের কথা।

যেবার ওর সত্যিকারের চাকরি গেল। যেবার বরখাস্ত পত্রটি মুরারীদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে রতন দত্ত অগ্রিম সাবধানবাণী শুনিয়েছিল: আপনার বোঠানের কাছে গিয়ে আবার দরবার করবেন না যেন। হুকুম এবার নড়বে না। বুঝেছেন?

যতীন এখনো ফেরার। ঋদ্ধি সকাল-সন্ধ্যা প্রেসে হাজিরা দেয়। কলেজে ক্লাসও করে। তবে বছরে ক'টা দিনই বা ক্লাস হয়? নিত্যি ত্রিশদিন হাঙ্গামা লেগে আছে—ধর্মঘট, বন্ধ আর ঘেরাও। শুধু এই স্থানীয় কলেজে নয়, সর্বত্র।

গোটা পশ্চিমবঙ্গে।

এবারেও সেই একই অপরাধ। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি। মাত্রাতিরিক্ত আর একটা রসিকতা! এবার কলেজ ম্যাগাজিন নয়, সামান্য একটা বিয়ের পদ্য। যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর ছেলের বিয়ে। যোগেন্দ্রনাথ এই মফঃস্বল শহরের এক বিখ্যাত ব্যক্তি—স্থানীয় বার-এর শুধু প্রাচীনতম নয়, সবচেয়ে পসার-ওয়ালা ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। বিয়েটা শুক্রবার। সোমবার তিনি নিজে এসে পদ্যটা ছাপতে দিয়ে গেলেন।

চৌধুরীমশাই এককালে পদ্য-টদ্য লিখতেন। মফঃস্বল পত্রিকায় তা ছাপাও হয়েছে। বহুদিন লেখেননি। এবার জজ-সাহেবের কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ স্থির হওয়ায় তাঁর কাব্য-প্রতিভা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেটা স্বাভাবিক—যৌতুকের পরিমাণটা কবিতা লেখার প্রেরণা-জাগানো! পুত্রবধূকে সম্বোধন করে উনি একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। অন্ত-মিল ওয়ালা। ঐ যাকে বলে মিত্র-অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

মুরারীদার প্রতিশ্রুতি মতো ম্যানেজার কথা দিয়েছিল—বিবাহের দিন সকালে, শুক্রবারে সকাল সাতটার মধ্যে ছাপানো বিয়ের পদ্য ডেলিভারি দেওয়া হবে—বরযাত্রীরা আটটা দশের লোকাল ধরতে রওনা হবার আগে।

হৈ হৈ করে ছাপা হয়ে গেল পদ্যটা। মুরারীদা প্রুফ দেখল। ঋদ্ধি ক'দিন ধরে না-পাত্তা। সে যে কখন কোথায় যায় টের পাওয়া যায় না। তাই তাকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া গেল না।

পদ্যের বাণ্ডিল বাঁধা হল, সময় মতো পেঁছেও দেওয়া হল—কিন্তু জজ-বাড়ি, বিবাহ-বাসরে তা বিলি করা গেল না। বাণ্ডিল বাঁধা প্যাকেটগুলো ফিরে এল প্রেস-এ। উপায় নেই। ছাপাখানার ভূতের নৃত্যটা সেই 'গুপী-বাঘা'র ভূতের রাজার নাচকেও হার মানায়। ছানি-চোখো ভূতের-রাজার তাণ্ডবটা!

টাইপ বসাতে বসাতে শম্ভুচরণ জিজ্ঞাসা করেছিল, দাদু, চৌধুরীমশাই এটা কী লিখেছেন বলুন তো?

মুরারীদা জানতে চায়, কী লিখেছেন? পড়ে শোনাও?

—'বরিবারে আসিয়াছ পুত্রেরে আমার।' তা 'বরিবার' মানে কী?

মুরারীদা তখন অন্য একটা প্রুফ নিয়ে ব্যস্ত। বলে, ফুটকিটা সরে নড়ে গেছে আর কি। 'বরিবার' বলে তো কোনও 'বার' নেই, ওটা রবিবার' হবে।

গ্যালি প্রুফে তাই ছিল। পরে মুরারীদা বিবেচনা করে দেখে। কবি

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'বার' নিয়ে একটা বাড়াবাড়ি রকমের গড়বড় করেছেন। বিয়ে হচ্ছে শুক্রবার, বৌভাত পরের সোমবার। এর মধ্য রোশ্বার আসে কোথা থেকে? সেটা তো কালরাত্রি! নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো মুরারীদা পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে 'শুক্রবার' বসিয়ে দিল। লাইনটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো: 'শুক্রবারে আসিয়াছ পুত্রেরে আমার।'

তাও না হয় ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু ব্লকটা?

ম্যানেজার ওভারটাইমের বন্দোবস্ত করে বাড়ি যাবার আগে বলে গেল, পদ্যের মাথায় জোড়া-হাতের ব্লকটা দিতে ভুলবেন না যেন।

মুরারীদা বলে, মনে আছে ভায়া। ঠিক ম্যানেজ করে দেব।

গ্যালি ভাঙার পরেই ব্লকটার দরকার। বিয়ের পদ্যে বহুবার ব্যবহৃত ব্লক। দুটি হাত। একটিতে রিস্টওয়াচ, অপরটিতে মকরমুখী বালা। তার উপর দিয়ে একটা গোড়ে মালা আর নিচে একটি পেরজাপতি।

কিন্তু কোথায় গেল ব্লকটা? খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ। ইতিমধ্যে ধুশ্ করে লোড-শেডিং হয়ে গেল। শম্ভুচরণ বললে, দাদু, এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে পাওয়া যাবে না। কাল দিনের আলো ফুটতেই এসে যাব। চারশ কপি ছাপতে তো আধঘণ্টাও লাগবে না।

মুরারীদা ধমক দিয়ে ওঠে। বলে, ওটি হচ্ছে না! দেশলাই-মোমবাতি নিয়ে আয়। আজ রাতেই ছাপা শেষ করতে হবে।

শম্ভুচরণ বলে, আমি কথা দিচ্ছি—সব দায় ঝক্কি আমার। কাল সকালে নিশ্চিত ডেলিভারি দেব। সকাল সাতটার আগেই।

—কিন্তু আমি যে ম্যানেজারকে কথা দিলাম, আজ রাতেই ছাপা শেষ করে রাখব!

—আপনার কী দোষ? আপনি কি জানতেন এমন বেমক্কা লোড-শেডিং হয়ে যাবে?

—দা'ঠাকুর কি জানতেন, বন্যায় রেল-লাইন ভেসে যাবে?

শম্ভুচরণ সিনেমাটা দেখেছে। দাদাঠাকুর হাঁটা পথে জলকাদা ভেঙে স্কুলের প্রশ্নপত্র সময়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বললে, কখন কারেণ্ট আসবে কে জানে! মুশকিল হয়েছে—বাবলুটার জ্বর দেখে এলাম কিনা সকালে—

একটু হকচকিয়ে যায় মুরারীদা। নিজে নিঃসন্তান, কিন্তু ছেলের অসুখে বাপের মনটা যে কেমন করে তা বুঝবার মতো অনুভূতিটুকু আছে ওর ঐ ছাবিবশ ইঞ্চি ছাতিতে। বলে, বাবলুটা আবার জ্বরে পড়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ দাদু। টাইফয়েডে না দাঁড়ায়।

—তবে যা। আমি একাই ম্যানেজ করে দেব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কারেণ্ট এসে যাবে।

আসেনি। তবে মোমবাতির আলোর হাৎড়ে হাৎড়ে ব্লকটি খুঁজে বার করে। 'সেট' করে। লোড-শেডিং মিটলে নিজেই মেশিন চালিয়ে চারশ কপি ছেপে ফেলে। পঞ্চাশ করে গুনতি করে আটটি বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দেয়। যাতে কাল সকালে শম্ভু এসে তাড়াহুড়ি পেঁছে দিতে পারে।

মরাকাটা ঘর পার হয়ে যখন বাড়ি পানে চলেছে তখন মফঃস্বলের রাত নিশুতি।

পরদিন বোঝা গেল কাণ্ডটা। ছানি-পড়া চোখে মোমবাতির আলোয় যে ব্লকটা মুরারীদা ব্যবহার করেছে, সেটা মেথিলেটেড-স্পিরিটের বোতলে লেবেল-মারার কাজে লাগে। হাত নয়, দুটি হাড়। গোড়ে মালা নয় ওটা: স্কাল! কাল রাতে যেটাকে 'পেরজাপতি' বলে ঠাওর হয়েছিল সেটা সাবধানবাণী: পয়জন!

সবচেয়ে মারাত্মক হল রসিকতা। চৌধুরীমশাই যখন দক্ষযজ্ঞ বাধাবার উপক্রম করছেন তখন মুরারীদা গরুড়পক্ষীর মতো হাত দুটি জোড় করে বলে বসল: ওটা ভুলে-ভাট্টে হয়ে গেছে চৌধুরীমশাই। লোড-শেডিং-এর আঁধারে। তবে হ্যাঁ, আমি কিন্তু এককাঠি উপরে উঠেছি। হাতে-হাতে মেলাবার কথা—আমি হাড়ে-হাড়ে মিলিয়ে দিয়েছি!

ঐ রসিকতাটাই শেষ ছোবল!

চাকরিটা চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেল!

আশ্চর্য! চাকরি নেই, হাজরির খাতায় সই দিতে দেওয়া হয়নি, তবু পরদিন সকালে দেখা গেল মুরারীদা টুমটুম হয়ে বসে আছে তাব সাবেকি টুলে। গ্যালিপ্রুফ দেখছে একমনে।

উপায় কী? কল্যাণীকে বলা যায়নি—জঙ্গীপুরের ভিটেয় এখন বিশু-ঘুঘু চরছে! নেতাই ফৌৎ হয়েছে একথা বলেছে, কিন্তু নিমু যে আদালতে দাঁড়িয়ে জ্যেঠার আদ্যশ্রাদ্ধ করেছে সেটা জানাতে পারেনি। সান্ত্বনা এটুকু যে, সুনীল ইতিমধ্যে জানিয়েছে নিমুর কাছ থেকে আদায় করে নেতাইয়ের বিধবাকে সে বেশ কিছু টাকা পাইয়ে দিয়েছে।

সুনীলের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে নেতাইয়ের বিধবা জেঠাইমাকে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটি পোস্টকার্ডও লিখেছে। যে জেঠ্শাশুড়িকে সে চেনে না, চোখেও দেখেনি কোনদিন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে মেয়েটি আঁকাবাঁকা হরফে আবোলতাবোল কী-সব লিখেছে! ভাগ্যে পোস্টকার্ডখানা কালীতারা প্রেসের ঠিকানায় আসে, তাই কল্যাণীর হাতে পড়েনি। মুরারীদাই সেটা পড়েছে। কল্যাণীকে না জানিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। কী দরকার বুড়িটাকে জানানো—নিমাই আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ খেয়ে স্বীকার করেছে যে, তার পিতার বৈমাত্রেয় দাদা স্বর্গত! কল্যাণী অহেতুক একটা দাগা পেত। দা'ঠাকুর কী যেন বলতেন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে: 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'! যে-কথায় শ্রোতা দাগা পাবে—হোক তা হক কথা—কী দরকার সেটা শোনানোর? মুরারীদা চিঠিখানা পেয়ে খুশি হয়েছিল যেমন, তেমনি দাগাও পেয়েছে। নেতাইয়ের বৌয়ের যত্ব-নত্ব জ্ঞান নেই। পোস্টকার্ড তো নয়, যেন গ্যালিপ্রুফ! তা হোক, তবু মুরারীদার ছানি-পড়া চোখেও একটা গোপন-কথা ধরা পড়েছিল।

'জেঠামশাইকে আমার প্রাণভরা সতকোটি প্রণাম দিবেন'—পংক্তিটার উপর এক-ফোঁটা জলের চিহ্ন। লেখাটা ধেবড়ে গেছে! বোকা মেয়ে! 'প্রণামে'র বিশেষণ কি 'প্রাণভরা' হয় রে পাগলী? তবে ঐ এক ফোঁটা চোখের জলে তোর সব বানান ভুলের অপরাধ ধুয়ে গেছে! ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন!

মুরারীদা যথারীতি প্রুফ দেখছে।

ম্যানেজারের আর সহ্য হল না। কাছে এসে ধমক দিয়ে ওঠে, আপনি আবার এসেছেন?

মুরারীদা চোখ তুলে তাকায়। গলকণ্ঠটা বার কয়েক ওঠানামা করে। নিশ্চুপ কয়েকটা মুহূর্ত সে তাকিয়ে থাকল ঐ তরুণ ম্যানেজারের দিকে।

—কী হল? জবাব দিন?

—মালিক তো বলেননি এ টুলে আমার বসা মানা।

সবাই হাতের কাজ থামিয়েছে। শম্ভুচরণ, কিষ্টো, বলাই, গোলাম, বংশী। সবাই ভালবাসে তাদের দাদুকে। ওদের ইউনিয়ান নেই, তাই বলে ভালবাসা থাকবে না?

ম্যানেজার সকলের উপর চোখ বুলিয়ে কী যেন বুঝে নিল। তারপর গলা নামিয়ে বলে, কিন্তু বিনা-মজুরিতে আপনিই বা এখানে খাটবেন কেন?

—তাতে আপত্তি আছে তোমার?

স্বয়ং মালিককেই নাম ধরে ডাকে, ম্যানেজারকে তো 'তুমি'ই বলবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

—নিশ্চয় আছে। আমার জানা দরকার আপনি কেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এসেছেন।

মুরারীদা ম্লান হাসে। বলে, যেহেতু এ বনের প্রতিটি চারাগাছ আমার নিজে হাতে লাগানো ম্যানেজার-সাহেব! তুমি তো শুধু ফলন্ত গাছ দেখছ, আমি যখন এ বনে প্রথম আসি তখন একটা ঘাসও ছিল না—সবটাই ছিল খাঁ-খাঁ-করা ব্রহ্মডাঙার মাঠ।

ম্যানেজার সামলে নেয়। লক্ষ্য করে দেখে কর্মীরা সবাই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

তবু পরাজয়টা এক কথায় মেনে নেওয়া চলে না। বলে, ওসব সেন্টিমেন্টের কথা বাদ দিন। আসল কারণ যদি কিছু থাকে তবে বলুন, নচেৎ বিদায় হন—

মুরারীদা রাগ করে না। বলে, ওটাই আসল কারণ ম্যানেজার। তবে এসব সেন্টিমেন্টের কথা তো তোমার মগজে ঢুকবে না, তাই যে-যুক্তি তোমার পক্ষে সহজবোধ্য সেটাই বলি—মাইনেটা না দাও, টিফিনটা তো দেবে? ওটা প্রাক্তন মালিকের ব্যবস্থাপনা। এ-জমানার নয়।

ম্যানেজার আর কথা বাড়াতে সাহস পায় না। সে একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পেয়েছে কর্মীদের চোখে।

দেখা গেল, মালিকও এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। উট্‌কো একটা লোক কেন টুলে বসে প্রুফ দেখে। সেও আর পেরে উঠছিল না। মা বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন। মুরারীদার বাড়িতে টিফিন-ক্যারিয়ারে করে খাবার পাঠানো নিয়েই হয়তো একটা দক্ষযজ্ঞ হয়ে যেত—হল না, মুরারীদা প্রত্যাখ্যান করায়। তার নাকি গুরুর মানা!

স্ত্রী থেকেও নেই। বাক্যালাপ বন্ধ করেনি; কিন্তু সে যেন সাতে নেই, পাঁচে নেই। মুরারীদার হয়ে সুপারিশ করতে আসেনি। ছেলেটা ক্রমশ বাউণ্ডুলে হয়ে উঠছে। শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপ-বেটায় দেখাই হয় না। বাড়িতে এই পরিস্থিতি, তাই প্রেসে কোনও নতুন হাঙ্গামা রতনের বরদাস্ত হল না।

ইতিমধ্যে সুছন্দা একদিন মুখোমুখি কথা বলেছে ঋদ্ধির সঙ্গে। শুধু মুরারীকাকুকে জানিয়েই সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি।

—তোর সঙ্গে কিছু জরুরী কথা ছিল, ঋদ্ধি।

ঋদ্ধি একটু ঘাবড়ে যায়। বলে, জরুরী কথা! কী নিয়ে?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সুছন্দা ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসে ওর মুখোমুখি। ঋদ্ধি পরিবেশটা হাল্কা করতে বলে ওঠে, ওরে বাবা! তুমি যে পালানোর পথ বন্ধ করে দিয়ে এসে জেরা শুরু করছ।

সুছন্দা হাসল না। বললে, তোর সঙ্গে যতীনের দেখা হয়?

ঋদ্ধি আন্দাজ করেছিল ঠিকই। বললে. হয়। খুব কম। মাসে একদিনও হয় কিনা সন্দেহ। কেন?

—ও কোথায় থাকে আজকাল?

—ঠিক জানি না। জানলেও তোমাকে বলতে পারতাম না।

—কেন?

—বুঝতেই তো পারছ। পার্টির নির্দেশ!

—পার্টি! নকশাল-পার্টি?

—নামে কী আসে যায়, মা? কিন্তু যতীনরা যে একটা নিষিদ্ধ রাজনৈতিক পার্টিতে আছে তা তো জানই।

—'যতীনরা' বলছিস কেন? উত্তম পুরুষের বহুবচন তো ব্যবহার করলি না!

ঋদ্ধি জবাব দিল না।

—কী হল? বল? তুই আছিস ওদের দলে?

ঋদ্ধি এবার চোখে-চোখে তাকায়। বলে, এসব কথা তোমার যত কম জানা থাকে ততই মঙ্গল।

—কেন?

—তুমি স্বাভাবিকভাবে সরল প্রকৃতির। কেউ প্রশ্ন করলে গুছিয়ে মিছে কথা বলতে পারবে না। তা ছাড়া প্রত্যেকের জীবনেই কিছু গুপ্তকথা থাকে। তার ভার নিজেকেই বইতে হয়—ওয়ান শুড ক্যারি ওয়ানস ঔন ক্রস!

—কিন্তু আমি যে তোর মা, খোকা!

—তাতে কী? আমার যদি বিয়ে দাও তাহলে তার সব গোপনকথা কি তোমাকে বলতে পারব? নাকি তোমার 'গোপনকথা' তাকে খুলে বলতে পারব —যেহেতু সে আমার সহধর্মিণী!

সুছন্দা চমকে ওঠে: আমার 'গোপনকথা'! মানে?

—ও একটা কথার কথা!

সুছন্দা আশ্বস্ত হয়। বলে, বেশ! ব্যক্তিগত 'গোপনকথা' আমি জানতে

চাইছি না। কিন্তু সাধারণভাবে 'অ্যাকাডেমিক' আলোচনা করতে আপত্তি আছে তোর?

—কী বিষয়ে? আমাদের পার্টির?

—হ্যাঁ! 'তোদের' পার্টির! ঐ আজব শ্লোগানটা তোরা বলিস কোন আক্কেলে: 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান'।

ঋদ্ধি হাসল। বলল, আগে বল, এই শ্লোগানটাকে 'আজব' বিশেষণে বিভূষিত করলে কেন?

—কেন করব না? মাও সে-তুঙ অন্য একটা স্বাধীন দেশের নেতা! জানি না, তোদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কতটা যোগাযোগ; কিন্তু তোরা তো সন্দেহাতীত ভাবে জানিস—তিনি ভারতীয় নন। ভারতের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই!

—না! কথাটা তোমার ঠিক হল না, মা! সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহের যেখানে যত নিপীড়িত, শোষিত বঞ্চিত মানুষ আছে তার সঙ্গেই তাঁর নিবিড় সম্পর্ক! তার চেয়েও বড় কথা: মাও সে-তুঙ তো একজন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। তিনি একটা 'আইডিয়া'! একটা প্রতীক! ঠিক যেমন তোমার ঐ নারায়ণ শীলাটা! তুমি জান, তা একাটা বিশেষ জাতির জীবাশ্ম—হিমালয় থেকে সংগৃহীত—যার কার্বোনেড অণুগুলো সিলিকেট হয়ে গেছে! তুমি তাতে দেবত্ব আরোপ করেছ বলেই তার মাহাত্ম্য! নয় কি?

সুছন্দা তর্ক করেনি। সে প্রশ্নের মোড় ঘোরায়। বলে, তোরা দেশনেতাদের মূর্তি ভাঙছিস কেন তাহলে? তোরা জানিস না, ঐ পাথরের মূর্তিগুলোতে দেশের সাধারণ মানুষ দেবত্ব আরোপ করছে।

—জানি, মা। আমরা মূর্তি ভাঙছি না। ভাঙছে এক-একটা ভ্রান্ত 'আইডিয়া'। ঐ পাথরের মূর্তিগুলোকে 'শিখণ্ডী' খাড়া করে যারা দেশটাকে লুটে পুটে খেতে চায়—তারাই আমাদের মূল লক্ষ্য! জোতদার, মিলিওনেয়ার, মিল-মালিক—আর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি সেজে যারা আমাদের শোষণ করছে তাদেরই 'খতম' করতে চাইছি আমরা। বিশ্বাস কর—সর্বহারার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলে আমরাই আবার ঐ মূর্তিগুলোকে বানাব—প্রতিষ্ঠা করব!

—কিন্তু তোরা কি বুঝিস না—তোদের এই কাজকে দেশের সাধারণ মানুষ অন্য চোখে দেখছে? তারা ভাবতে বসছে—তোদের মন্ত্র: 'দেশের ঠাকুর ফেলি, বিদেশের কুকুর পুজিয়া।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

—সেটাও জানি। ইন ফ্যাক্‌ট—ও নিয়ে আমাদের দলে মতবিরোধ রয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁরা এ কর্মসূচী অনুমোদন করেন না। তাঁদের ধারণা, এতে আমরা জনসমর্থন হারাবো। যতীনও তাই বলে, আমারও ব্যক্তিগত মত সেটাই! দেখা যাক্‌ কী নির্দেশ আসে শেষ পর্যন্ত!

সুছন্দা একটু ভেবে নিয়ে বললে, তুইও কি একদিন যতীনের মতো আত্মগোপন করবি?

ঋদ্ধি উঠে দাঁড়ায়। বলে, এবার কিন্তু তোমার প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেল মা! তা এখনই কী করে বলি?

মাসখানেক এ-ভাবেই কেটে গেল। মুরারীদা প্রতিদিন আসে। খাতায় সই করতে দেওয়া হয় না তাকে। টুলে বসে প্রুফ দেখে, কম্পোজিটার আসতে দেরি করলে বা ছুটি নিলে বসে কম্পোজ করে। মেশিনে গড়বড় হলে উবু হয়ে বসে মেরামতিও করে। কেউ আপত্তি করে না, বরং সহকর্মীরা সাহায্যই করে। বলাবাহুল্য বরাদ্দ মতো পাউরুটি-ঘুঘ্‌নিও খায়।

মাসান্তে সবাই হিসাব মতো মাইনে পেল। মুরারীদার চোখের সামনে দিয়ে রেভিন্যু-স্ট্যাম্পে সই নিয়ে মাস-মাহিনা নিতে অনেকেরই বাধো-বাধো লাগল।

মুরারীদা নির্বিকার। শম্ভুচরণ কাছে ঘনিয়ে এসে বললে, অনেকগুলো টাকা তো আজ পেলাম, দাদু কিছু ধার নেবেন?

মুরারীদা হাসতে হাসতে বলে, কেন রে? বামুন-মানুষ একাহারী হয়, শুনিস্‌নি?

—কিন্তু সারাদিনে মাত্র দু-পীস পাউরুটি খেয়ে—

বংশী বলে, দু-পীস নয় শম্ভুদা, দাদু এক-পীস কাগজে জড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। দিদার জন্যে। আমি দেখেছি।

গোলাম কুদ্দুস বলে, প্রাইভেট ট্যুশানি করবেন দাদু? খোঁজ-খবর নেব?

মুরারীদা বলে, পরে বলব। ভেবে দেখি।

একাদশীর উপবাস। আজকাল আর নিরম্বু উপবাস করতে পারেন না। ডাক্তারের বারণ। অনেকক্ষণ খালি পেটে থাকলে পেটে কেমন যেন যন্ত্রণা হয়। সন্ধ্যায় পুজো-আর্চা সারার পর তাই যাহোক কিছু মুখে দিতে হয়। সারাটা দিন বইপত্র নাড়াচাড়া করেন। ভগবান ওটুকু করুণা করেছেন—চোখ দুটি ঠিক

www.banglabookpdf.blogspot.com

আছে। ছানি পড়েনি। বৌমা তার লাইব্রেরী ঘর থেকে বইয়ের যোগান দিয়ে যায়। রামায়ণ আর কথামৃত এ ঘরেই থাকে। তবে এক নাগাড়ে তো ধর্মপুস্তক পড়া যায় না; তাই বৌমা রেখে যান বঙ্কিম, প্রভাত মুখুজ্জে, রমেশ দত্তের বই। কখনো বা আধুনিক লেখকের বাছা-বাছা বই—যা ওঁর ভাল লাগতে পারে—'আরোগ্য-নিকেতন', 'দেবযান', 'কালের-মন্দিরা'। তার চেয়েও যাঁরা আধুনিক তাদের বই শাশুড়ীর কাছে পাঠায় না। এ বয়সে নতুন করে পাঠক-মানস তৈরী করার না আছে উৎসাহ, না ক্ষমতা।

আজ কিন্তু উনি সারাদিন বইয়ের পাতা ওল্‌টাননি। সময় কাটতে চায় না। একটিমাত্র সন্তান—সে যেন দিন-দিন কেমন হয়ে গেল। দিনান্তে একবারও এসে বলে না, 'কেমন আছ, মা?' অথবা 'ডাক্তারের দেওয়া ওষুধগুলো খাচ্ছ তো ঠিক?' এসব প্রশ্ন বাহুল্য। রতনও জানে, তার মাও জানেন। তিনি কেমন আছেন এ প্রশ্ন জানার কৌতূহল ওর নেই। আর ডাক্তারের দেওয়া ওষুধপত্র বৌমা ঘড়ির কাঁটা ধরে খাইয়ে যায়। সে কথা নয়। কথা হচ্ছে, 'কথা-বলার' কথা। দিনান্তে মায়ের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কুশল প্রশ্ন। ওঁর হঠাৎ মনে হল, একই বাড়িতে আছেন—কিন্তু পুরো একটি সপ্তাহে পুত্রের মুখদর্শনের সৌভাগ্য হয়নি।

এ-সব কথা কি আজ নতুন করে জানছেন? তা নয়। সকালবেলা মোক্ষদা এসে অহেতুক খুঁচিয়ে ঘা করে গেল বলেই জানা-কথা নতুন করে জানতে হচ্ছে।

মোক্ষদা—মানে, নেদেরপাড়ার হালদার গিন্নি আজ সকালে এসেছিলেন। সারাটা সকাল জ্বালিয়ে গেছেন। লোকে পাড়া-বেড়াতে যায় অপরাহ্ণ বেলায়। মোক্ষদার সবই উল্‌টো। বৌমাদের ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে সকলেই আধিক্যেতা দেখাতে এসেছিলেন।

কিন্তু ওটা কী আবোল-তাবোল বলে গেল মোক্ষদা? কথাটা বিশ্বাসই হয় না। হালদার-গিন্নির মনটা বড় ছোট!

হালদার মশাই সস্ত্রীক তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন ভেনাস-ট্রাভলস্‌-এর যাত্রীবাগিতে। রতন নিজেও গিয়েছিল। উত্তর-ভারতের অনেক তীর্থ দেখিয়ে এনেছে। কিন্তু মোক্ষদা তীর্থ দেখেছে থোড়াই! তার নজরটাই বাঁকা! সারাক্ষণ সেই বাঁকা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে সহযাত্রী-যাত্রিণীরা কখন কে কী করছে! বড়খোকা নাকি সারাটা পথ একটি মেয়ের সঙ্গে গুজ্‌গুজ্‌-ফুস্‌ফুস্‌ করেছে। সব সময়েই তার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি! না, মেয়েটি যাত্রী-পার্টির নয়।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কোম্পানির লোক। হালদার গিন্নির ধারণা—বিশেষ কারণে ঐ মেয়েটিকে চাকরিতে জিইয়ে রেখেছে বড়খোকা! অযাচিত পরামর্শ দিয়েছে—বৌমার উচিত যাত্রীগাড়িতে সোয়ামীর সঙ্গে যাওয়া। তাকে চোখে চোখে রাখা!

কথাটা বিশ্বাস হয়? ঘরে যার অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা—কিন্তু এ-কথাও তো ঠিক, বড়খোকা কোনদিনই বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে যায় না। উনি কতবার বলেছেন। বলে বলে হার মেনে গেছেন। আশ্চর্য! বৌমাও তো নিজে থেকে কখনো যেতে চায় না। তিনি একলা পড়ে থাকবেন—এ কি একটা অজুহাত? তাহলে বৌমা যেতে চায় না কেন?

শাশুড়ীর সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হয়েছে দেখে সুছন্দা পুজোঘরে এল। একটি পশমের আসন বিছিয়ে দিয়ে ঠাঁই করে দিল। ঝি চাকরেরা জানে, এসব কাজে তাদের থাকতে দেয় না সুছন্দা। তারা এ দিগড়ে নেই। মায়ের জলযোগটুকু এবার নিয়ে আসে। একটা পাথরের রেকাবিতে নানান ফলমূল—শশা, কলা, আপেলের টুকরো, দুটি সন্দেশ, আর ঘরে করা ছানা। পাত্রটা নামিয়ে রাখতেই বৃদ্ধা বললেন, দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে একটু এসে বস তো বৌমা। কথা আছে।

সুছন্দা একটু অবাক হয়। এ সুরে উনি সচরাচর কথা বলেন না। এ সময় পুজোঘরের কাছাকাছি বড় একটা কেউ আসে না। ঋদ্ধি আর তার বাবা বাড়ি নেই। তবু শাশুড়ীর কথায় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে বসল।

বৃদ্ধা প্রশ্ন করেন, হালদার গিন্নি কি তোমাকে কিছু বলেছে?

সুছন্দার মনে পড়ে গেল, নেদেরপাড়ার হালদার মাসিমা ও-বেলা এসেছিলেন। মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ বক্‌বক করে গেছেন। সুছন্দা জানত, তিনি সম্প্রতি যাত্রীবাগিতে তীর্থ করে এসেছেন। সেই সব ভ্রমণ কাহিনীই শোনাচ্ছিলেন নিশ্চয়। এখন ও'র প্রশ্নের ধরনে মনে হল, তিনি বিশেষ কোন কথাও বলে গেছেন, যা আলোচনা করার আগে ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে হয়। বললে, না তো? অনেক তীর্থ দেখে এসেছেন, সে-কথাই শুধু বললেন।

—বড়খোকার বিষয়ে?

নয়ন নত হল সুছন্দার। নেতিবাচক গ্রীবা সঞ্চালন করল শুধু।

—মোক্ষদার মনটা বড় কুচুটে। চাঁদের দিকে তাকালে শুধু তার কলঙ্কটাই দেখতে পায়।

কথাটা বলে বৌমার দিকে মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন। সুছন্দা কোন কৌতূহল দেখালো না। পাথরের থালাটা ঠেলে দিয়ে বললে, আর একটু

www.banglabookpdf.blogspot.com

ছানা দেব? শশাগুলো হয়তো চিবাতে পারবেন না!

বৃদ্ধা আহার শুরু করলেন না। কেমন যেন একটু খটকা লাগে। এমন একটা কথায় বৌমার মেয়েলি কৌতূহল জাগল না কেন? বিশেষ, প্রসঙ্গটা যখন তার সোয়ামী সংক্রান্ত!

আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, এবার।

—ওর কোম্পানিতে মীনা নামে একটি মেয়ে চাকরি করে বলছিল মোক্ষদা, তুমি তার নাম শুনেছ?

কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু চোখে চোখে তাকাতে পারে না। বলে, মীনা ও'র কর্মচারী নয়, পার্টনার।

—পার্টনার! তার মানে?

—অংশীদার। ভেনাস-ট্রাভেলস্‌-এর অর্ধেক শেয়ারের মালিক।

বৃদ্ধা রীতিমতো বিস্মিতা। বলেন, তুমি তাকে দেখেছ? কত বয়েস?

—না, দেখিনি। বয়স বোধহয় আমারই মতো।

—কুমারী, সধবা না বিধবা?

—তিনটির একটিও নয়। ডিভোর্সড্‌। মানে বিয়ে হয়েছিল, এখন বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

—কতদিন ধরে খোকার ব্যবসায়ে অংশীদার হয়েছে?

এবার চোখে চোখে তাকায়! বুঝিয়ে বলে সব কথা। অর্থাৎ ভেনাস-ট্রাভেলস্‌ ঐ মেয়েটিরই সৃষ্টি। সে ছিল রত্নেশ্বরের সিনিয়ার পার্টনার শশী পারেখের স্ত্রী। রতনই তার ব্যবসার অর্ধেক শেয়ার ক্রয় করেছে। সুছন্দা এ সংসারে আসার পূর্বেই।

বৃদ্ধা বেশ কিছুক্ষণ শশার কুচিগুলি নিয়ে নাড়া চাড়া করলেন। মুখে দিলেন না। আবার প্রশ্ন করেন, ঐ মেয়েটি কথা তুমি কতদিন আগে শুনেছ?

—অনেকদিন। খোকা তখন আমার কোলে!

—কই, আমাকে তো কিছু বলনি?

এর কী জবাব? কিন্তু বৃদ্ধা নীরব থাকতে দিলেন না। বলেন, চুপ করে রইলে কেন বৌমা? সব কথা এতদিন আমাকে বলনি কেন?

—কী লাভ এসব গ্লানিকর কথা পাঁচকান করে?

চাপা আক্রোশে বৃদ্ধা তাঁর মনের ক্ষোভ সামনে যাকে পেলেন তার উপরেই উগড়ে দিলেন, আমি বাইরের লোক নই বউমা! আমি তার মা!

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আবার চোখে চোখে তাকায়। বলে, যে-রোগের ওষুধ নেই তা নিয়ে অহেতুক হা-হুতাশ করে কী লাভ, মা। আপনাকে অহেতুক দাগা দেব না বলেই এতদিন কিছু বলিনি।

চমকে ওঠেন বৃদ্ধা, ওষুধ নেই? তুমি ঠিক জান?

—জানি। পনের বিশ বছরের পুরানো ব্যাধি যে! সহ্য করা ছাড়া উপায় কি? নিন. মুখে দিন।

—মুখে আমার কিছু দিতে ইচ্ছে করছে না, বৌমা!

ম্লান হাসল এবার। বললে, তা বললে তো শুনব না মা। আমি তো আজ পনের বিশ বছর ধরেই···

বৃদ্ধা বাধা দিয়ে বললেন, তোমার সংকোচের কথাটা বুঝতে পারি; কিন্তু আশ্চর্য! পারুলও তো আমাকে ঘুণাক্ষরে কোনদিন কিছু জানায়নি!

—কে? মা? না, তিনি কিছুই জানেন না!

এতক্ষণে চোখ দুটি জলে ভরে আসে!

অবাক বিস্ময়ে পুত্রবধূর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। যেন আজ ওকে প্রথম দেখছেন! ও কি ওঁরই বৌমা, না কোন শাপভ্রষ্টা দেবী! এতবড় একটা জগদ্দল বোঝা এতদিন একা-একা বয়ে বেড়াচ্ছে! শাশুড়ীর কাছে একথা স্বীকার করতে সংকোচ হতেই পারে—তাবলে পনের-বিশ বছরের ভিতর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে একদিনের তরেও সে হু-হু করে কেঁদে মনটা হালকা করেনি। দত্তবাড়ির কলঙ্ক আকণ্ঠ পান করে সে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছে!

—শশাগুলো থাক। আর একটা কলা নিন। আর ছানাটা বেশি করে খেতে বলেছেন ডাক্তারবাবু।

টপ্ টপ্ করে দু-ফোঁটা জল ঝরে পড়ল পাথরের রেকাবিতে। বৌমা যদি দু'-দশক ঐ পাষাণভার বুকে নিয়ে শারীর-ধর্ম পালন করে থাকতে পারে, তাহলে তিনিও বা তা পারবেন না কেন?

একটু সামলে নিয়ে বললেন, একটা কথা, বৌমা। তুমি পার, কিন্তু আমি চোখের উপর এটা দেখে সইতে পারব না। আজ মন খুলে কয়েকটা কথা বলি, কিছু মনে কর না। আমিও অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু বুঝতে পেরেছি। তবে এতদিন ভুলে তোর উপরেই রাগ করতাম! ভাবতাম, মেয়েটা দেমাকি! আমার ছেলের মর্যাদা বুঝল না। মনকে বোঝাতাম, ওরা বড় হয়েছে, যা ভাল বুঝছে তা করছে—আমি বুড়ি মানুষ, কেন ওসবের মধ্যে নাক গলাতে যাই?

www.banglabookpdf.blogspot.com

তোরা যে এক ঘরে শুতে যাস্ না তা কি আর আমার নজরে পড়েনি?

মুখটা বুকের উপত্যকায় ঝুঁকে পড়ে।

—না রে মা! লজ্জা করিস্ না। তুই তো তোর মা-শাশুড়ীতে ফারাক করিসনি। তাই আজ বৌমা নয়, মেয়ের সঙ্গেই কথা বলছি আমি!

সুছন্দা নীরবে বসেই রইল সমুখে। তারও চোখে জল এসে যায়।

—আর একটা কথা। মুরারীর চাকরিটা গেছে না আছে?

আবার একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ। এ বাড়ির সবাই খবর পেয়েছিল—চৌধুরী-মশায়ের ছেলের বিয়ের পদ্যে গণ্ডগোল হওয়ায় মুরারীকাকুর চাকরি আবার খতম হয়েছে। এবার বংশীর মারফতে নয়, স্বয়ং রতনই এসে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিল তার গর্ভধারিণীকে। শাসিয়েও রেখেছিল, তুমি এবার এসব ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা কর না। ঐ বুড়ো-হাবড়াকে আমি আর চাকরিতে রাখতে পারব না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার। আর নয়!

তবুও লজ্জার মাথা খেয়ে বৃদ্ধা বলেছিলেন, কিন্তু কর্তা যে ওকে···

—ব্যস্! কোন কথা নয়! কর্তার দোহাই দিয়ে অনেকবার ওকে বাঁচিয়েছ। কিন্তু এবার নয়! তুমি পুজো-আর্চা নিয়ে আছ, তাই থাক! এ বিষয়ে আমি কোন কথা শুনব না।

বৃদ্ধা তারপর চেষ্টা করেছিলেন গোপনে মুরারীঠাকুরপোর আহার্য টিফিন-ক্যারিয়ারে করে পাঠাতে—মানে, যতদিন না বেকার মানুষটার একটা হিল্লে হয়। অভিমানী ব্রাহ্মণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আজব অজুহাতে: তার নাকি গুরুর মানা!

বৃদ্ধার বুকে শেল বিদ্ধ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, স্বর্গবাসে তাঁর স্বামীও উতলা হয়ে উঠেছেন। কিন্তু হঠাৎ আবার খবর এল—এবার পাঁড়েজীর মারফৎ—মুরারী যথারীতি তার টুলে এসে বসছে। কাজ করছে। পাঁড়ে অবশ্য জানত না, সে হাজরি-খাতায় সই দেয় কিনা, মাসান্তে মাহিনা পায় কি না। যেটুকু দেখেছে, সেটুকুই জানিয়েছে। তাই বৃদ্ধার এই কৌতূহল।

সুছন্দা ভিতরের ব্যাপারটা জানত। সে সত্যমিথ্যা এড়িয়ে শাশুরীকে বললে, ওসব চিন্তা করে মনকে বিচলিত করবেন না মা! আপনি তো চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এখন ভবিতব্য যা হবার তাই হবে।

বৃদ্ধা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না! আমি আর এ সংসারে থাকতে পারব না বৌমা। গুরু মহারাজ অনেকদিন ধরেই লিখছেন ওঁর আশ্রমে গিয়ে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

থাকতে। তুই টিকিট কাটার ব্যবস্থা করে দে। ইন্দ্র আমাকে পেঁছে দিয়ে আসবে।

—সেই ভাল। যান, কিছুদিন কাশীই ঘুরে আসুন।

—না রে, মা! 'ঘুরে আসুন' নয়, যে-কটা দিন বাঁচব বাবা বিশ্বনাথের চরণতলাতেই পড়ে থাকব।

সুছন্দা বুঝতে পারে, কী নিদারুণ অভিমানে উনি একথা বলছেন। বলে, সেসব কথা পরে। আপাতত ইন্দ্র আপনাকে কাশীতে পেঁছে দিয়ে আসুক তো। তারপর দেখা যাবে! কবে যেতে চান?

—যত শিগ্গির টিকিট পাওয়া যাবে। পাঁজি দেখে একটা ভাল দিন দ্যাখ্।

—ঠিক আছে। ওঁকে বলব।

—'ওঁকে' বলার কী আছে? তার অনুমতি নিতে হবে নাকি? একদিন না একদিন তার নজরে পড়বেই এ ঘরখানা খালি। তখন শুধোলে ওকে বলে দিও। আর, ও হ্যাঁ! টিকিটের টাকাটা ওর কাছে হাত পেতে নিও না। আমার চেকবইটা নিয়ে এস।

সুছন্দা প্রতিবাদ করে না। এ ছাড়া কীভাবেই বা ঐ অসহায়া বৃদ্ধা তাঁর অভিমানের বহিঃপ্রকাশ করতে পারেন? কিন্তু সে কি বুঝবে? 'অভিমান'ও তো এখন একটা আজব বস্তু যা আলাদীনের সেই দৈত্যটার নাগালের বাইরে! টাকা-আনা-পাইয়ে তার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।

দিন দুই পরে গবলেটে স্কচ ঢালতে ঢালতে রত্নাকর তার ধর্মপত্নীকে জিজ্ঞাসা করল, ইন্দ্র বললে, মায়ের জন্য নাকি একখানা বেনারসের টিকিট কিনে এনেছে? ব্যাপার কী? মা কি বেনারস যাচ্ছে নাকি?

মদের বোতল আর ভাজাভুজির প্লেট সাজিয়ে দিয়ে সুছন্দা অদূরে একটা সোফায় বসে নিটিং-এর কাঁটায় সোয়েটার বুনছিল—ঋদ্ধির মাপে। বললে, হ্যাঁ! বুধবার।

—কে নিয়ে যাচ্ছে? ইন্দ্র?

—ইন্দ্রই!

—কই মা আমাকে তো কিছু বলেনি?

—তোমার সঙ্গে মায়ের শেষ সাক্ষাত হয়েছে কবে?

রতন হেসে ওঠে। বলে, যাব্বাবা। আমরা কি ভিন্ন দেশের বাসিন্দা?

www.banglabookpdf.blogspot.com

ডেকে পাঠালেই গিয়ে দেখা করতুম। তা কদ্দিনের জন্যে?

—আমাকে বলেননি। তুমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও বরং।

—ব্যাপারটা কী বলতো? এবার যাত্রী বগীতে মাকে নিয়ে যাইনি বলে শোধ তোলা হচ্ছে ছেলের উপর?

সুছন্দা জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

ঋদ্ধিও একই প্রশ্ন করল পরদিন, কী ব্যাপার? দিদা নাকি কাশী যাচ্ছেন? কবে ফিরবেন?

—তা আমাকে কেন? দিদাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস্ কর না!

—ও ব্বাবা! দিদা খচে ব্যোম্ হয়ে আছে! জিজ্ঞেস করলে হয়তো জবাবে বলবে—তোদের সংসারে আর কোনদিনই ফিরে আসব না।

সুছন্দা বলে, আমাকে অন্তত তিনি সে-কথাই বলেছেন।

ঋদ্ধি ইতস্তত করে। এটা-ওটা ধরে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে। তারপর বলে, তা, হঠাৎ দিদার এমন মতিগতি হল কেন? সংসারে এবম্প্রকার বীতরাগ?

হঠাৎ রাগ হয়ে গেল সুছন্দার। বললে, তুই জানিস্ না? তোর উপর অভিমান করেই তো! লেখাপড়া চুলোর দোরে দিয়ে দিনরাত বাউণ্ডুলের মতো কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস! উনি সইতে পারছেন না। এসব কথা তুই জানিস না, বুঝিস্ না?

ঋদ্ধি হাসতে থাকে। জবাব দেয় না।

—কী বোকার মতো হাসছিস্! জবাব দে!

—কী জবাব দেব, মা? আমি শুধু ভাবছি, তুমি কি কথার ছলে আত্মরক্ষা করতে এ-কথা বলছ, না কি মনকে প্রবোধ দিতে দিতে এই আকাশজোড়া মিথ্যাটাকে নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছ!

—কী আকাশ জোড়া মিথ্যা?

—তুমি জান—কেন দিদার এই বীতরাগ। কার উপর অভিমান করে তিনি সব কিছু ছেড়ে কাশী চলে যাচ্ছেন!

—কার উপর?

—তোমার!

—আমার? আমার উপর? মানে? আমি কী করেছি?

—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেবার চেষ্টা করছ। জীবনের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছ! ক্রমাগত আপস করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চাইছ! বিদ্রোহিনী

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

হতে সাহস পাচ্ছে না!

থমকে গেল সুছন্দা। ঋদ্ধি কতটা জানে? ঋদ্ধি কতটা বুঝতে পারে? কলেজে পড়ে। ফিলজফি অনার্স। সাইকোলজি ওদের একটা পেপার। বাবা আর মায়ের মাঝখানে যে একটা অতলান্ত সমুদ্র জেগে উঠেছে এটুকু বুঝে নেবার মতো বুদ্ধি তার নিশ্চয় আছে। কিন্তু সে দায়ী করে কাকে? মীনা পারেখের কথা সে নিশ্চয় জানে না—জানার সম্ভাবনা নেই। তাহলে?

ঋদ্ধি হাসি-হাসি মুখেই বলে, এবার কিন্তু তোমার দান।

—আমার দান?

—আলোচনাটা চালিয়ে যেতে হলে এবার তোমার কথা বলার পালা।

সুনন্দা গম্ভীর হয়ে বলে, তুই নিজেই না সেদিন বলেছিলি—'এভ্রি-ওয়ান শুড ক্যারি ওয়ান্স ঔন ক্রুশ'?

—বলেছিলাম। কথাটা আমার নয়। বাইবেলের। প্রত্যেককে নিজ-নিজ ক্রুশকাঠ নিজের কাঁধেই বহন করে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। অপরের স্কন্ধে সে ভার চাপানো যায় না। দ্বিতীয় ব্যক্তি—সে যতই সহানুভূতিশীল হোক—হাত বাড়িয়ে সাহায্য করতে পারে না।

সুছন্দা কোনক্রমে চোখের জল রুখে বললে, তাহলে তুই আজ যে বড় তোর হাতখানা বাড়িয়ে দিতে চাইছিস? মায়ের বোঝা লাঘব করতে চাইছিস!

—না মা! আমি শুধু সেণ্ট ভেরোনিকার ভূমিকাটুকু পালন করতে চেয়েছিলাম! আর পারল না। ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল এবার। ঋদ্ধি এক-পা এগিয়ে এল। মায়ের লুটিয়ে পড়া আঁচলটাই তুলে দিল তার হাতে। সেন্ট ভেরোনিকার ভুমিকাটাই পালন করল শুধু।

যীজাস যখন ক্রুশকাঠ কাঁধে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঐ মেয়েটি এগিয়ে এসেছিল—না, জগদ্দল-বোঝার ভার ভাগ করে নিতে নয়। আঁচল দিয়ে তাঁর মুখখানি শুধু মুছিয়ে দিতে।

ঋদ্ধিমান যেন সেই মুহূর্তে অনেক-অনেক বড় হয়ে গেল। মা নয়, ওর ছোট্ট মেয়েটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার মাথায় একখানা হাত রেখে বললে, 'We never live; we are always in the expectation of living" —কথাটা ভলতেয়ারের!

'বেঁচে থাকা মানে প্রাণধারণের গ্লানি নয়, বাঁচার মতো বেঁচে থাকার প্রত্যাশাই হচ্ছে জীবন!'

www.banglabookpdf.blogspot.com

মা চলে যাবার দিন-সাতেক পরে একদিন হঠাৎ বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত!

পুলিস এসে ঘেরাও করল প্রেস!

কী ব্যাপার?

এখানে নাকি বে-আইনী ইস্তাহার ছাপা হয়—একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের। যারা রাষ্ট্রদ্রোহী—গণতন্ত্রের শত্রু, সমাজের শত্রু!

আকাশ থেকে পড়ল রত্নেশ্বর।

খবর পেয়ে ছুটে এল গাড়ি নিয়ে। থানা-অফিসার শুধু নয়, কলকাতা থেকে একজন উচ্চ পর্যায়ের পুলিস-অফিসারও হাজির!

—কী বলছেন স্যার! কালীতারা প্রেসে বে-আইনী ইস্তাহার! দু-পুরুষ ধরে—

—থামুন! ন্যাকা সাজবেন না মিস্টার দত্ত! আমাদের ডেফিনিট খবর আছে। এই সার্চ-ওয়ারেণ্টে সই করে দিন। ইচ্ছে হলে আমাদের তল্লাসী করে প্রথমে দেখে নিন—আমরা সমস্ত প্রেসটা সার্চ করব।

শুরু হল খানা-তল্লাসী।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার করা গেল কিছু কাটা প্রুফ। ও. সি.-র হাতে যে ছাপানো ইস্তাহারটা আছে তারই গ্যালিপ্রুফ!

রত্নেশ্বরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ম্যানেজার চোখে দেখল যোজন-বিস্তৃত সর্ষে ফুলের ক্ষেত!

কলকাতার পুলিস-অফিসার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন, কী মশাই? দুজনেই একেবারে সিক্ত-মার্জার হয়ে গেলেন যে?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে···বিশ্বাস করুন স্যার, আমরা কিছু জানি না।

—শাট্ আপ! বিনয়! অ্যারেস্ট কর! দুটোকেই। হ্যাঁ, মাজায় দড়ি বেঁধে ভ্যানে তোল!

হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল রত্নেশ্বর দত্ত! বললে, ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি স্যার, আমি···আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না—

থানা-অফিসার একটু ইতস্তত করছিল। একেবারে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে, মাজায় দড়ি বেঁধে রত্নেশ্বর দত্তকে অ্যারেস্ট করতে তার বাধ বাধ লাগতেই পারে। সে স্থানীয় পুলিস-অফিসার। নানাভাবে সে ঐ ধনকুবেরের কাছে অনুগৃহীত। বিশেষ, ওর কর্মচারীর দল একটু দূরে সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

চোখের সামনে···

হঠাৎ রত্নেশ্বরের নজর হল—ভীড়ের পিছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ঋদ্ধি। থানার বড়বাবুও সেটা নজর করেছে। ছেলের চোখের সামনেই বাপকে···

ভিড় ঠেলে ঋদ্ধি এগিয়ে আসছিল।

কোথাও কিছু নেই যেন আশমান ফুঁড়ে আবির্ভূত হল মুরারীদা। ঋদ্ধিকে মারল এক গোঁত্তা! একেবারে আচমকা! সে বোধহয় এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ল কার গায়ে।

মুরারীদা এসে মহড়া নিল সামনে দাঁড়িয়ে। গরুড় পক্ষীর মতো হাত দুটি জোড় করে থানা-অফিসারকে বললে, উনি সত্যি কথাই বলছেন স্যার, মালিক সত্যিই কিছু জানেন না!

—বটে! তার মানে আপনি জানেন কে এটা কম্পোজ করেছে?

—জানি স্যার। আমি নিজেই।

—আপনি এই প্রেসের কম্পোজিটার?

—আজ্ঞে না, আমি প্রুফ-রীডার ছিলাম। এখন চাকরি নেই—

—তাহলে এটা কম্পোজ করল কে?

—আমিই। আমি প্রেসের সব কাজ জানি। বিশ্বাস না হয়, এদেরকে শুধিয়ে দেখুন।

থানা-অফিসার রতনকে বলেন, চলুন; আপনার ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন। এদের চলে যেতে বলুন। প্রেসের বাইরে।

রতনের ঘরে মুরারীদাকে নিয়ে এসে থানা-অফিসার জনান্তিকে জানতে চায়, এবার বলুন। কম্পোজ করেছেন আপনি, প্রুফ দেখেছেন আপনি, কিন্তু মেশিন চালিয়ে ছেপেছে কে?

—আমিই স্যার।

—ঠিক আছে। মেনে নিলাম। আপনি বলতে চান, ম্যানেজার বা মালিক কিছু জানে না। প্রেসের আর কেউ আপনাকে সাহায্য করেনি। আপনি একা হাতেই সবকিছু করেছেন! তাই বলতে চাইছেন তো?

—তাই বলতে চাইছি!

—তার কী পরিণাম হবে সেটুকু বুঝতে পারছেন?

মুরারীদা জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই রইল।

—ঠিক আছে। এবার বলুন, কে এটা ছাপতে দিয়েছিল প্রেসে?

www.banglabookpdf.blogspot.com

মুরারীদা সবিস্তারে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়। না, প্রেসে কেউ ছাপতে দেয়নি। অর্ডার-এন্ট্রি নেই—ম্যানেজার বা মালিক কিছু জানেন না। মুরারীদা নিজ দায়িত্বে গোপনে এ-কাজ করেছে। সবকিছুই একা-হাতে। আর সেটা সে করেছে নিতান্ত অভাবের তাড়নায়। হ্যাঁ, এটা যে বে-আইনি ইস্তাহার তা বুঝবার মতো বিদ্যে ওর আছে; কিন্তু গত মাসে তার চাকরি যায়, ঘরে রুগ্না স্ত্রী···হাঁড়ি চড়ে না···

প্রচণ্ড ধমকে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল থানার বড়বাবু, থাক! তোমাকে আর কাঁদুনি গাইতে হবে না, কে তোমাকে ছাপতে দিয়েছিল তাই শুধু বল?

—তা তো জানি না স্যার! চিনি না ছেলেটাকে। আগাম বিশ টাকা দিয়ে গেল, আর কাগজ। বললে, ডেলিভারি নেবার সময় বাকি ত্রিশ টাকা দেবে।

প্রচণ্ড একটা থাপ্পড়!

মাথা ঘুরে বসে পড়ল মুরারীদা!

সুইং-ডোরের ওপাশে রতনের নজর গেল। দাঁড়িয়ে আছে ঋদ্ধি।

—ন্যাকা! অচেনা-অজানা ছেলে! মিথ্যে কথা! এই শহরেরই ছেলে! তুমি চেন। স্বীকার কর!

—ঈশ্বরের দিব্যি স্যার! বাপের জন্মে দেখিনি তাকে।

বড় দারোগার হাতের ডাণ্ডাটা উঠতেই বাধা দিলেন কলকাতার অফিসার। বললেন, বাকি জেরা থানায় গিয়ে হবে। অ্যারেস্ট হিম।

সুইং-ডোর ঠেলে যখন সবাই বেরিয়ে এল তখন মুরারীদার মাজায় দড়ি-বাঁধা। তার তোবড়ানো গালে ফুটে উঠেছে পাঁচ-আঙুলের দাগ।

গলকণ্ঠটা বার-কতক ওঠানামা করল। মুরারীদা পিছন ফিরে বললে, রতন! তোমার কাকিমাকে···

—থামুন!—গর্জন করে ওঠে রত্নেশ্বর দত্ত! বলে, যে সর্বনাশ আপনি করে গেলেন তারপর আপনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই আমার। যান! এবার শ্রীঘর বাস করুন গিয়ে। অ্যাদ্দিনে আমরাও নিষ্কৃতি পেলাম। বাব্বা!

সদলবলে ওরা বেরিয়ে এল রাস্তায়। হাইস্ট্রীটে, ঐ যার নাম এখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড। ছোট্ট মানুষটাকে যখন মাজায় দাঁড়-বাঁধা অবস্থায় পুলিস ভ্যানে তোলা হচ্ছে ততক্ষণে রাস্তায় বেশ চাপ ভিড়। হঠাৎ সেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে ঋদ্ধি।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বলে, দাদু, তোমার চশমাটা···

থাপ্পড় খেয়ে যখন বসে পড়ে তখন চশমাটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। ঋদ্ধি সেটা কুড়িয়ে নেয়। মুরারীদা হাত বাড়িয়ে চশমাটা নিল।

হঠাৎ কী-জানি কেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধের মুখটা। বোধকরি তার মনে পড়ে গেল মা-জননীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিটার কথা—'তুমি কিছু চিন্তা কর না মা, আমি তো আছি!' ঋদ্ধির অশ্রুসজল মুখের দিকে তাকিয়ে মুরারীদা বললে, দাদু! আমায় তো কেউটেয় ছোবল মারল। দেখিস, ওদিকে তোর দিদিমা যেন চন্দ্রবিন্দু···

কথাটা শেষ হল না। দুরন্ত আবেগে ওর হাত দুটি তুলে নিয়ে ঋদ্ধি বললে, তুমি কিছু ভেব না ছোড়দাদু! আমি তো আছি···

পুলিসভ্যানটা রওনা হয়ে যায়।

ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল।

সকলের মতো রত্নেশ্বর দত্তও দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এবং সকলে যেটুকু দেখতে পায়নি, তাও। রহস্য-যবনিকা তিল তিল করে সরে যাচ্ছে। তাই··· তাই যখন পুলিসে রতনের মাজায় দড়ি পরাতে আসছিল তখন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছিল ঋদ্ধি। আর সেই জন্যেই তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে সরিয়ে মহড়া নিয়েছিল ঐ ছাপাখানার ভূতটা!

তার মানে থানার বড়-দারোগা অন্যায় চড়টা মারেনি! মুরারী চিনত, মুরারী চেনে! সরষের মধ্যেই ভূত!

এই মর্মান্তিক আবিষ্কার করে রত্নেশ্বর কিন্তু উৎফুল্ল হতে পারল না। তার মনে পড়ে গেল—যে ছেলে কোনদিন তার চোখে-চোখে তাকায়নি, আজ সে যাবার আগে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখেছিল বাপের দিকে। সে দৃষ্টিতে ছিল শুধুই—তীব্র ঘৃণা!

সন্ধ্যার পর রতন এসে উপস্থিত হল যোগেশ চৌধুরীর বাড়ি। বৃদ্ধ ওকে নিয়ে গেলেন ভিতর বাড়িতে। শহরে এটাই আজকের স্টপ-প্রেস হেড-লাইন নিউজ্। আড়ালে ডেকে সব কিছু আবার বিস্তারিত শুনলেন চৌধুরী-মশাই। এ-জেলার প্রবীনতম এবং বিচক্ষণতম ক্রিমিনাল—ল-ইয়ার। আদ্যন্ত শুনে বললেন, নেহাৎ কাঁচা কাজ করে বসে আছ রতন। কেস খুব সিরিয়াস!

—কেন চৌধুরী-কাকা? কী কাঁচা কাজ করেছি?

www.banglabookpdf.blogspot.com

—আরে বাপু, তুমি যা বললে তা আমারই বিশ্বাস হচ্ছে না, আদালত বিশ্বাস করবে? একটা কর্মচারী, যাকে বরখাস্ত করেছ, যে হাজরীখাতায় সই দেয় না, মাইনে নেয় না, সে লোকটা দিনের-পর দিন তোমার প্রেসে এসে কাজ করে গেছে? মেশিন চালিয়েছে? এ কী বিশ্বাসযোগ্য?

—কিন্তু সেটাই তো সত্যি কথা কাকা। মুরারীবাবু···

—না, 'মুরারীবাবু' নয় রতন, যদ্দিন এ কেসের ফয়শালা না হচ্ছে তদ্দিন ও তোমার 'মুরারীকাকু'! শোন! কাল সকালেই তোমার কাকিমার সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করবে। বুড়িটা না-খেতে পেয়ে টেঁসে গেলে মুরারী হোস্টাইল হয়ে যেতে পারে।

রত্নেশ্বর বোঝে—কেন ওঁকে সবাই এত পাকামাথার উকিল বলে। এক কথায় রাজি হয়ে যায়। জানতে চায়, আপনি কি তাহলে মুরারীকাকুকে জামিনে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করবেন?

—আজকাল এ-সব কেসে জামিন হয় না। বিচারই হয় না, তার জামিন! দ্বিতীয়ত আর একটি কাজ তোমাকে আজ রাত্তিরেই সারতে হবে। মন দিয়ে শোন—

—বলুন?

—তুমি তো এককালে নাটক-ফাটক করতে। তোমাদের ঐ গোবিন্দসড়ক বারোয়ারিতে?

ধরতাইটা ধরতে পারে না। স্বীকার করে।

—একবার তারাশঙ্করের 'দুই-পুরুষে' তোমাকে অভিনয় করতে দেখেছিলাম, মনে আছে। কী 'রোল' ছিল তোমার?

—সে তো আমার স্কুল-জীবনের শেষাশেষি। চরিত্রের নামটা মনে নেই। ঐ নুটুবিহারীর ছেলের পার্ট।

—নুটুবিহারী করেছিল বিশু গাঙ্গুলী, তাই নয়?

—হ্যাঁ, বিশুদাই। কিন্তু এসব কথা কেন জানতে চাইছেন চৌধুরী-কাকা?

—ঐ নাটকের একটি দৃশ্য আজ রাতে তোমাকে অভিনয় করতে হবে। এবার তোমার নুটুবিহারীর 'রোল'। বাড়ি ফিরে ছেলেকে ডেকে পাঠাবে। হাতের কাছে একটা কাচের গ্লাস বা কাপ-ডিশ্ রেখ। কোথাও কিছু নেই, গায়ে পা তুলে ছেলের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে। তারপর ক্ষেপে আগুন হয়ে যাবে। আছাড় মেরে গ্লাস বা কাপ-ডিশটা ভাঙবে। ছেলেকে বলবে—'বেরিয়ে যা! দূর হয়ে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

যা এই মুহূর্তে ! তোর মুখদর্শন করব না !' বুঝলে ? চেঁচামেচিটা এমন মেগদারের হওয়া চাই যাতে বাড়ির ঝি-চাকরেরা টের পায়। অর্থাৎ ঋদ্ধির গৃহত্যাগের একটা বিশ্বাসযোগ্য এভিডেন্স থাকে।

রতন অবাক হয়ে শুনছিল। বললে, তারপর ?

—তারপর তোমার স্ত্রীর মারফতে ছেলেকে লুকিয়ে হাজার-খানেক টাকা দেবে। দেখ, যেন আজ রাত্রেই ঋদ্ধি এক-কাপড়ে বেরিয়ে যায়।

রতন স্বীকার করে, ঠিক বুঝলাম না, চৌধুরী-কাকা !

—বুঝলে না ? এ তো সহজ কথা ! আজ রাতেই যদি পুলিসের হুড়ো খেয়ে মুরারী কবুল খায়, তাহলে কাল ভোর রাতে তোমার বাড়ি 'রেইড' হবে ! ঋদ্ধিকে বল, স্টেশানে গিয়ে ট্রেন ধরার চেষ্টা যেন না করে। সাইকেল নিয়ে বাদকুল্লা বা শান্তিপুর চলে যেতে। সেখান থেকে যেন ট্রেনে চাপে।

রতন বলে, আর কিছু ?

—না, আপাতত এইটুকুই। কাল সকালে মুরারীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা সেরে আমাকে এসে রিপোর্ট কর—দুটি কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা। আমি তারপর চেষ্টা করব জেল-হাজতে মুরারীর সঙ্গে দেখা করতে। তাকে রাজি করাতে হবে যতীন সোমের নামটা কবুল খেতে।

—যতীন সোম ?

—সেটাই সব দিক থেকে ভাল। যতীনের বিরুদ্ধে যা চার্জ আছে তাতে এটা সমুদ্রে শিশিরবিন্দু। গুলি খেয়ে যদি যতীন না মরে তাহলে এ অপরাধের জন্য তার জেলের মেয়াদের কোন হেরফের হবে না ! দ্বিতীয়ত রাম-শ্যাম-যদু যাহোক একটা নাম কবুল না-খাওয়া তক্ মুরারী হাজতে অহেতুক মারধোর খেতে থাকবে। ব্যাপারটা ওকে বোঝাতে হবে—

—আর কিছু বলবেন ?

—বলব। ব্যাপারটা ডেলিকেট। তবু পরামর্শ যখন নিতে এসেছ তখন সব কথাই খোলাখুলি বলা উচিত আমার। তুমি কি এটা বুঝতে পারছ যে, তোমার মাথার উপরেও খাঁড়া ঝুলছে ?

—আমার ? আমি তো সাতে-পাঁচে নেই কাকা !

—সাতে-পাঁচের কথা হচ্ছে না, রতন। হচ্ছে, পুলিসের দৃষ্টিতে তোমার ভূমিকাটা। ঋদ্ধির নামটা এখনো পুলিসের সন্দেহ-তালিকায় নেই। যে মুহূর্তে মুরারী ঋদ্ধির নামটা কবুল খাবে অমনি তোমাকে পুলিসে অ্যারেস্ট

www.banglabookpdf.blogspot.com

করবে। তোমার ঐ অবিশ্বাস্য গল্পটা পুলিস মেনে নেবে না। ভাবতে বসবে—বেটার সঙ্গে বাপও আছে এর ভিতর। না হলে একটা বরখাস্ত কর্মীর হাতে প্রেসঘরের চাবি থাকে কী-করে ?

রতন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

চৌধুরী-মশাই নির্বিকারভাবে বলতে থাকেন, এ-কেসের সঙ্গে পুলিস তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে হয়তো জড়াতে পারবে না ; তাই তোমাকে জেলের ভিতর আটকে রাখতে তারা অন্যান্য দিক থেকে আক্রমণ করবে। তোমার বাড়ি সার্চ হবে। অনেকে আবার বোকার মতো নিজের বাড়িতেই ফল্স্-সিলিঙ বানিয়ে অস্ট্রিচ্ সাজতে চায় তো !

রতনের শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা কেউটে সাপ নেমে গেল।

স্টেজের উপর নয়, জীবনের রঙ্গমঞ্চেও ঐ দৃশ্যটা অভিনয় করেছে রতন। বাপের কথায় জ্বলে উঠে মুহূর্তে গৃহত্যাগ করেছিল। আজ তার নুটুবিহারীর 'রোল'। কিন্তু ঐ ম্যাদামারা ছেলেটা ঠিকমতো অভিনয় করতে পারবে তো ? চোখে-চোখে তাকাতেই পারে না হতভাগাটা। ক্ষিপ্ত হয়ে এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করাটা কি ওর হিম্মতে কুলাবে, বাবার দেওয়া হাজার টাকা পকেটে থাকলেও ? চেষ্টা করতে হবে অন্যভাবে। সুছন্দা গোঁয়াড়, কিন্তু বুদ্ধিমান। সব কথা তাকে আগেভাগে বুঝিয়ে দিতে হবে। ঋদ্ধিকে ডেকে তালিম দেবার চেষ্টা বৃথা। গবেটটা বুঝবে না—কেন তাকে বিক্ষুব্ধ সন্তানের চরিত্রটা অভিনয় করতে হচ্ছে। কেন, বাপের সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করাটা দরকার ! বাস্তবে বাপের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে প্যারিস কি না পারিস সেটা কোন কথা নয়—এ তো অভিনয় !

বাস্তবে কিন্তু পরিকল্পনা মতো দৃশ্যটা অভিনয় করা গেল না। অর্থাৎ যেটা অভিনয় করার কথা ঘটনাচক্রে সেটাই বাস্তবে ঘটে গেল।

গাড়ি গ্যারেজ করে নেমে এসেই নজর হল ঋদ্ধি সাইকেল নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। তার সাইকেলের কেরিয়ারে একটা টিফিন-বাক্স। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তবু জানতে চায়, কোথায় যাচ্ছ এত রাতে ?

যথারীতি মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে বলে, ছোড়দিদার কাছে। খাবারটা পেঁছে নিতে।

—তোমাকে যেতে হবে না। পাঁড়ে দিয়ে আসবে। তুমি ওপরে এস, কথা আছে।

—কী কথা ?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

—কী-কথা তা এখানে দাঁড়িয়ে বলব নাকি ? যা বলছি শোন।

দেখা গেল অন্ধকারে এগিয়ে এসেছে সুছন্দা। বললে, খাবারটা দিয়ে ফিরে আসতে ওর আধঘণ্টা-খানেক লাগবে। ও ফিরে এলেই না হয় বল। তুই যা খোকন।

হুংকার দিয়ে উঠল রত্নেশ্বর, না! যাবে না! আমার যা বলার আছে তা এখনই বলতে চাই। খাবারটা পাঁড়ে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

বারান্দায় বামুনদি কৌতূহলী হয়ে ঘরে দাঁড়িয়েছে। ইন্দ্র পাঁড়ে এগিয়ে এসে সাইকেলটা ধরেছে। সেই বলে ওঠে, সাইকেলটা আমাকে দাও ছোটবাবু। আমি দিয়ে আসছি। তুমি বড়বাবুর সঙ্গে ওপরে যাও।

ঋদ্ধি একটু ইতস্তত করে। তারপর রাজি হয়ে যায়।

ওরা দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে। রতন নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। টেবিলে হট-কেসে ঢাকা দেওয়া আছে কী-একটা কাঁচকড়ার প্লেট। সাজানো আছে হুইস্কির বোতল, গ্লাস। সুছন্দা নিঃশব্দে আইস-কিউবের বোল আর টংটা রেখে গেল। রতন নজর করে দেখে গ্লাসটা ওর একটা সৌখীন পানপাত্র—কাট-গ্লাসের। তা হোক! ঐটাকেই আছাড় মেরে ভাঙতে হবে আজ! যে প্রচণ্ড বিপদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে তার কাছে ঐ সৌখীন পানপাত্রটা অকিঞ্চিৎকর। একদিক দিয়ে ভালই হল। এভিডেন্সটা এতে জোরদার হবে। মুরারীটা যদি আজ রাত্রেই কবুল খায়, আর কাল সকালে পুলিস এসে দেখে ঋদ্ধি গৃহত্যাগ করেছে, তখন এটাকে সাজানো-ব্যাপার বলে মনে হবে না। সত্যিকারের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য না হলে কেউ অমন দুর্মূল্য বেলজিয়ান কাট-গ্লাসের পানপাত্র আছাড়ে ভাঙে না।

রতন এসে বসল স্টাফড্-চেয়ারে। ঋদ্ধি দাঁড়িয়েই রইল। রতন সরাসরি নেমে এল কাজের কথায়—মুরারীবাবুকে কাগজগুলো কে ছাপতে দিয়েছিল তুমি জান? www.banglabookpdf.blogspot.com

ঋদ্ধি চোখ তুলে চাইল না। মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে বলল, সে তো তুমিও জান। জান না?

—বাঃ! দিব্যি বোল্ ফুটেছে দেখছি! বাপের হোটেলে খাই আর বনের মোষ তাড়াই!

ঋদ্ধি জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

নাটক ঠিক নয়। নাটকে নির্দিষ্ট ডায়ালগ থাকে। এ অনেকটা 'কবির

www.banglabookpdf.blogspot.com

লড়াই' ঢঙের। কথোপকথন মুখে মুখে তৈরী করে নিতে হচ্ছিল রতনকে—কিন্তু স্থির লক্ষ্য সেই চিহ্নিত ক্লাইম্যাক্স।

অচিরেই উপনীত হল সেখানে।

আছড়ে ভাঙল বেলজিয়ান কাট-গ্লাসের পানপাত্রটা। চীৎকার করে শুনিয়ে দিল চৌধুরীমশায়ের পরিকল্পিত ডায়লগটা।

ঋদ্ধির কোনও ভাবান্তর হল না। নতনেত্রে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই রইল। খুলে গেল পাল্লাটা। সুছন্দা এসে দাঁড়িয়েছে। পথ রুখল ঋদ্ধি। বললে, খালি পা নয় তো?

সুছন্দার পায়ে হাওয়াই চটি ছিল। সে নিঃশব্দে ভিতরে এসে রুদ্ধ করে দিল দরজাটা। স্বামীর দিকে ফিরে বললে, সব জিনিসের একটা সীমা থাকবে তো? www.banglabookpdf.blogspot.com

রতন গর্জে ওঠে, সব জিনিসের আছে কি না জানি না, কিন্তু আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে। কাল সকালে উঠে যদি দেখি ও দূর হয়ে যায়নি, তাহলে নিজে হাতে আমি ওকে গুলি করে মারব।

সুছন্দা আগুন-ঝরা চোখে স্বামীর দিকে নীরবে তাকিয়েই রইল। ঋদ্ধি বললে, মা, তুমি একটু বাইরে যাও। নজর রেখ, কেউ যেন এদিকে না আসে। বাপির সঙ্গে আমার কিছু জরুরী গোপন কথা আছে।

সুছন্দা ছেলেকে বলে, আজ থাক বরং। শান্তভাবে বিচার করে দেখার মত মেজাজ নেই এখন তোর বাপির।

আশ্চর্য! যেমন ছা, তেমন মা! তাঁর ভর্ৎসনায় ছেলেটা চ্যাতালো না। আর স্বামী ছেলেকে নিজে হাতে গুলি করে মারতে চায় শুনে মা-ও তিলমাত্র টলল না। সবাই দার্শনিক যে!

রতন গম্ভীর হয়ে বললে, তাই ভাল। তোমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে আজ রাত্রেই সেটা বলে ফেলা ভাল। কাল তুমি সুযোগ না-ও পেতে পার। মুরারীবাবু যদি আজ রাত্রে কবুল খায়, তাহলে কাল ভোর রাতে এ-বাড়ি রেইড হতে পারে।

চৌধুরীমশায়ের কাছে কথাটা শুনে সে নিজে যেভাবে চমকে উঠেছিল, ওদের তেমন কোন ভাবান্তর হল না।

সুছন্দা শুধু বললে, অসীম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হলেও মুরারীকাকু স্বীকার করবে না—কে তাকে ইস্তাহারটা ছাপাতে দিয়েছিল।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কী ছেলেমানুষের মতো বিশ্বাস! ওদের ধারণা নেই স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিস কতটা এগিয়ে যেতে পারে।

রতন এবার ঋদ্ধিকে প্রশ্ন করে, কী বলতে চাও এবার বল। অমন মাটির দিকে তাকিয়ে মিনমিনে গলায় নয়, ঝেড়ে কাষ!

আদিষ্ট হয়ে এবার বাপের দিকে তাকায়। বলে, দিনকাল পাল্টে গেছে, বাপি। তুমি আমাকে খোলা দরজা দেখিয়ে দেবে আর আমি গোঁয়াড়ের মতো বাড়ি ছেড়ে চলে যাব—এ আজকাল হয় না!

—বটে! তবে আজকাল কী হয়? বাপের হোটেলেই ভাল-মন্দ সাঁটব আর তার বুকের উপর বসে দাঁড়ি ওপড়াব?

ঋদ্ধি গম্ভীর হয়ে বললে, শান্ত ভাবে আলোচনা করার মেজাজ যদি তোমার না থাকে তাহলে মা যা বলছে তাই হোক—এখন এ আলোচনা বন্ধই থাক।

—বল্ না কী বলতে চাস্?

—আমি অনেক ভেবে দেখেছি, বাপি। সমস্যা নানান জাতের। দিদা এ বাড়িতে টিকতে পারল না—সে আজ কাশীবাসী। তুমি এ পরিবেশে সুখী নও। আমি, মা আমরা দুজনেও আর সহ্য করতে পারছি না। এতগুলো সমস্যার কিন্তু একটাই উৎস—একটাই সমাধান!

—কী সেটা? আমতা-আমতা কর না। খুলে বল—তোমার কী বক্তব্য?

—তুমিই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।

রতন হকচকিয়ে যায়। নিজের অজান্তেই বলে, মানে?

—হ্যাঁ। ঐটাই একমাত্র সল্যুশান! একমাত্র সমাধান। তাহলে দিদাকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারব। এই বাড়ি আর প্রেসটা তুমি মায়ের নামে লিখে দিয়ে যাও। ভেবে দেখ—অনেক ইনভেস্ট করেছ বটে, কিন্তু এ দুটি তুমি পেয়েছিলে উত্তরাধিকার সূত্রে। 'ভেনাস ট্রাভেলস' তোমার নিজের সৃষ্টি। তার উপার্জন থেকে তোমার বাকি জীবন সচ্ছন্দে কেটে যাবার কথা।

রতনের বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

ঋদ্ধি আরও বলে, আমার মতে মায়ের পক্ষে বেস্ট-কোর্স অব অ্যাকশান তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেওয়া···

সুছন্দা চাপা আর্তনাদ করে ওঠে, খোকা!

ঋদ্ধি উত্তেজিত হয় না। শান্তকণ্ঠে বলে, চেষ্টার তো ত্রুটি করনি মা! দু দশক ধরে গুমরে মরছ! পারলে? ধামা চাপা দিয়ে জীবনের সমস্যাকে

চোখের আড়ালে রাখতে পারলেই তার সমাধান হয় না। সমস্যাটার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। জীবনের দাবী লোকলজ্জার চেয়ে বড়! এ বয়সে বাপির জীবন-দর্শন তো পাল্টাবার নয়! ছেড়ে দাও না তাকে। যে জীবন তার কাম্য, তাতেই সে ফিরে যাক। তোমার, আমার, বাপির প্রত্যেকের একটা করেই তো জীবন? কলকাতা, বম্বে, দিল্লি যেখানেই থাক—মীনা পারেখ তার বৈধ স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃত হলেই কি সর্বদিক থেকে শোভন হবে না? তোমার, আমার, বাপির দিক থেকে!

সুছন্দা দ্বিতীয়বার আর্তনাদ করে ওঠে চাপাস্বরে: খোকা!

ঋদ্ধি বাপের দিকে ফিরে বলে, আজ আমার পরামর্শ তুমি মেনে না নিলেও শেষ পর্যন্ত এ বাড়ি তোমাকে ছেড়ে যেতে হবেই। যেদিন বুঝবে, তোমার জীবন এখানে বিপন্ন। তোমার লাইফের উপর অ্যাটেম্পট হতে পারে বুঝলে—তুমি নিজে থেকেই পালাতে চাইবে সেদিন!

রতন যেন বজ্রাহত!

—অ্যাটেম্পট মানে?—সুছন্দা চেপে ধরে ঋদ্ধির বাহুমূল।

—জোতদার আর ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের ওরা 'খতম' করছে, শোনোনি? লোকলজ্জার ভয়ে সিঁটিয়ে থেক না মা, যা অনিবার্য, তাকে মেনে নাও! মাথা সোজা রেখে!

রতনের ইচ্ছা করছিল এবার শিভাস-রিগ্যালের বোতলটা আছড়ে ভাঙে। কিন্তু তার হাত উঠল না। সর্বাঙ্গ যেন তার অবশ হয়ে গেছে।

ঋদ্ধি নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। কাচের আলমারি থেকে আর একটা কাচের গ্লাস নিয়ে এসে আস্তে করে নামিয়ে দিল বাপের নাগালের মধ্যে।

মায়ের দিকে ফিরে বললে, বামুনদিকে বল ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দিতে। ওরা খালি পায়ে ঘোরে তো, পায়ে কাঁচ ফুটবে।

যেন সেটাই দত্তবাড়ির শেষ সমস্যা।

তারপর নিচু হয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিল। বলল, দিন কয়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছি। পার্টির কাজে। কবে ফিরব বলতে পারছি না।

ধীরপদে এগিয়ে গেল দ্বারের দিকে।

বাপের পদধূলি নেয়নি। কিন্তু যাবার আগে সে আর একবার বাপের চোখে-চোখে তাকালো। বললে, ইতিমধ্যে তোমরা দুজনে নিজেদের মধ্যে ফয়শালাটা সেরে ফেল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

হ্যাঁ, সেই ম্যাদামারা মিনমিনে ছেলেটা এতদিনে বাপের চোখে-চোখে তাকিয়েছে। তবে তার দৃষ্টিতে না আছে আগুন, না ভৎর্সনা, না ঘৃণা!

যেন দার্শনিকের দৃষ্টি!

তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নর্দমায় ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকা মদ্যপকে।

করুণায় আপ্লুত।

কী যেন কথাটা বলেছিল মুরারীদা?

'কেউটে-বাচ্চার ছোবল'?

———

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf